দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

৭৮ বর্ষ, ২৮ সংখ্যা।। ৯ মার্চ, ২০২৬।। ২৪ ফাল্গুন, ১৪৩২
যুগাব্দ - ৫১২৭।। website : www.eswastika.com

তারেক রহমান কি পারবেন চ্যালেঞ্জের পাহাড় উতরে যেতে?

কুটুম্ব প্রবোধন → লক্ষ্য

যৌথ পরিবার

সংগঠিত পরিবার

সশক্ত পরিবার

সুস্থ পরিবার

সুরক্ষিত পরিবার

সমর্থ পরিবার

সম্পন্ন পরিবার

সুসংস্কৃত পরিবার

সমৃদ্ধ পরিবার

ব্যবস্থিত পরিবার

প্রভাবশালী পরিবার

আদর্শ পরিবার

প্রতিষ্ঠিত পরিবার

সন্তুষ্ট পরিবার

সুখী পরিবার

আনন্দিত পরিবার

আপনার এলাকায় কুটুম্ব প্রবোধন গতিবিধির কেন্দ্র খুলতে চাইলে
এই নম্বরে যোগাযোগ করুন— ৯৮৩৬৪৪৫৫২২ (9836445522)

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৮ বর্ষ ২৮ সংখ্যা, ২৪ ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

৯ মার্চ - ২০২৬, যুগাব্দ - ৫১২৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

'না আঁচালে বিশ্বাস নেই' হলো দুর্বল আর মেরুদণ্ডহীনের ভাষা : থাপ্পড়

☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

ভবানীপুর ভয়ঙ্কর ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তনের প্যারাডক্স

☐ ড. আত্রেয়ী সাহা ☐ ৮

নাড়ি-টুপি-আলখাল্লা, আতরোইল দাড়িপাল্লা

☐ সুভাষ চক্রবর্তী ☐ ৯

প্রসঙ্গ : বাংলাদেশ— তারেক রহমন কি পারবেন চ্যালেঞ্জের পাহাড় উতরে যেতে? ☐ সুজিত রায় ☐ ১১

বাংলাদেশ আপাতত রাহুমুক্ত— ঘাড় থেকে নেমেছে বেতাল

☐ ঢাকা থেকে প্রতিনিধি ☐ ১৪

অসমে প্রশ্নটা আর কে জিতবে নয়, প্রশ্ন বিজেপি কতটা এগিয়ে

☐ ধর্মানন্দ দেব ☐ ১৭

চিন্ময়কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর মুক্তির ইস্যুতে বাংলাদেশে বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ

☐ সেন্টুরঞ্জন চক্রবর্তী ☐ ২৩

সহস্রাব্দের ঝড় পেরিয়ে উড্ডীন সোমনাথের বিজয়কেতন

☐ সোমনাথ গোস্বামী ☐ ৩১

মানবোন্নতির পথে : ভ্রান্ত সাধনা থেকে সত্যদর্শন

☐ অনামিকা রায় ☐ ৩৩

আর্থ-সামাজিকভাবে অনগ্রসর পরিস্থিতি সংরক্ষণের মাপকাঠি হলে শেষ হবে তুষ্টীকরণের রাজনীতি

☐ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ☐ ৩৫

ভারত সীমান্তে জামাতের উত্থানে পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে ☐ মোহিত রায় ☐ ৩৯

'বন্দে মাতরম্'-এর অঙ্গচ্ছেদ ছিল দেশভাগের পৃষ্ঠভূমি

☐ দুর্গাপদ ঘোষ ☐ ৪৩

আমার সঙ্ঘজীবনের স্মৃতিকথা ☐ অবনীভূষণ মণ্ডল ☐ ৪৬

বাঙ্গালি কি আর গান সাইবে না? ☐ বিপ্লব বিকাশ ☐ ৪৮

গল্পকথায় ডাক্তারজী ☐ সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস ☐ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

☐ **চিঠিপত্র : ১৯** ☐ **অঙ্গনা : ২০-২১** ☐ **সুস্বাস্থ্য : ২২** ☐ **সমাবেশ-সমাচার ২৫-৩০** ☐ **স্মরণে : ৪৯**

প্রকাশিত হবে
১৬ মার্চ
২০২৬

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
১৬ মার্চ
২০২৬

কতটা শুদ্ধীকরণ হলো রাজ্যের ভোটার তালিকা?

প্রথমে বিরোধিতা, মানুষকে ভুল বোঝানো, বিরোধিতায় স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর রাজপথে মিছিল, তারপর হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট— সবশেষে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ। তাতে বাদ ৬০ লক্ষের বেশি, এখনও অমীমাংসিত প্রায় ৬০ লক্ষ নাম। এবার ধরনা মঞ্চে বসলেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রশ্ন উঠছে, শাসকদলের তীব্র বিরোধিতায় রাজ্যের ভোটার তালিকা কতটা শুদ্ধীকরণ হলো?

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয়েই আলোকপাত করবেন কয়েকজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০/ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০/ টাকা (মোট ২৮০০/) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০/ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০/ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সততার প্রমাণ রাখিতে হইবে

বিগত মাসের বারো তারিখে বাংলাদেশে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন হইয়াছে। তাহাতে তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়া সরকার গঠন করিয়াছে। নির্বাচন শান্তিপূর্ণ বা অবাধ হইয়াছে কিনা তাহা আলোচনার বিষয় না হইয়া সকলের মনে একটি একটি প্রশ্ন ঘুরপাক খাইতেছে, তাহা হইল ইহার পর বাংলাদেশে হিন্দু-সহ সংখ্যালঘু সমাজ শান্তিতে বসবাস করিতে পারিবে কিনা? ভারত বিভাজন তথা স্বাধীনতার বহু পূর্ব হইতেই বঙ্গীয় জীবনে বিধর্মীদের দ্বারা নানাবিধ অত্যাচার যেন বিধিলিপি হইয়া গিয়াছে। ত্রয়োদশ শতকে আরব সাম্রাজ্যবাদের পঞ্চমবাহিনী সুফি দরবেশ শাহ জালালের নেতৃত্বে বঙ্গীয় হিন্দুর ভাগ্য বিপর্যয় শুরু হয়। তাহার দ্বারা ধর্মান্তরিত নব্য মুসলমানরাই বঙ্গদেশে সুলতানি শাসনের পথ প্রশস্ত করিয়াছে। হিন্দুদিগের উপর অত্যাচার সংঘটিত করিতে তাহারা যেমন ইসলামি শাসনে শাসকের মদত পাইয়াছে, ইংরাজ শাসনেও অনুরূপ সমর্থন পাইয়াছে। ইসলামি শাসনেই পূর্ববঙ্গ মুসলমান আধিক্য হইয়াছে। তাহার ফলেই ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা শহরে মুসলিম লিগের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। পরিণামে ভারত তথা বঙ্গ বিভাজনের ন্যায় দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটিয়াছে। তাহারাই অ্যাসিড টেস্ট রূপে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথমে কলকাতায় এবং পরে পূর্ববঙ্গের নোয়াখালিতে হিন্দু নরসংহার সংঘটিত করিয়াছে। তাহাতে কত হিন্দু নারীর সম্ভ্রম ভুলুণ্ঠিত হইয়াছে, কত হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করিতে বাধ্য করা হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ভারত বিভাজিত হইয়া পূর্ববঙ্গ পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইলে পুনরায় হিন্দুদিগের ভাগ্যে দুর্ভাগ্যের করাল ছায়া নামিয়া আসে। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের কবল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন বাংলাদেশে পরিণত হইলেও হিন্দুদিগের উপর অত্যাচারের মাত্রার কোনোপ্রকার হেরফের ঘটে নাই। যদিও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে হিন্দুদেরই অধিক মাত্রায় প্রাণ বলিদান করিতে হইয়াছে। স্বাধীন বাংলাদেশে দফায় দফায় যেকোনো অজুহাতে বিশেষ করিয়া যেকোনো নির্বাচনের পর হিন্দুদিগের উপর আক্রমণ নামিয়া আসিয়াছে। তাহা খালেদা জিয়া অথবা শেখ হাসিনার শাসনামল হইলেও। গত বৎসর জেহাদি ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে নির্বাচিত সরকারকে উৎখাতের পর হিন্দুদিগের উপর যে নৃশংস অত্যাচার সংঘটিত হইয়াছে তাহা মধ্যযুগীয় ইসলামি শাসনকালকেও ম্লান করিয়া দিয়াছে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক নির্বাচনে জেহাদি শক্তির পরাজয়ের পরেও হিন্দুদিগের মানে একই প্রশ্ন, তাহাদের কি দুঃখের দিনের অন্ত হইল?

একথা নিশ্চিত যে, নির্বাচনে তারেক রহমানের জয়লাভ সাময়িকভাবে হিন্দুদিগকে স্বস্তি দিয়াছে। আওয়ামি লিগ নিষিদ্ধ থাকায় হিন্দু সমাজ অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সহিত তারেক রহমানের দলকেই সমর্থন করিয়াছে। কিন্তু এই বিএনপি-ই পূর্বে ভয়ঙ্কর জেহাদি ও পাকিস্তানপন্থী জামাতের সহিত জোট করিয়া হিন্দু নিধনে শামিল হইয়াছিল। বিগত এক বৎসর ধরিয়া জামাতিরা অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ইউনুসের মদতে বাংলাদেশ জুড়িয়া যে নৃশংস হিন্দু নির্যাতন চালাইয়াছে তাহাতে সমগ্র বিশ্বে তাহাদের ভাবমূর্তি ধূলিমলিন হইয়া গিয়াছে। বিশ্ববাসীর নিকট তাহারা বর্বর ও জেদাদি দেশ রূপে চিহ্নিত হইয়াছে। বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনের ফলাফলে প্রমাণ হইয়াছে যে, বাংলাদেশের সকলেই জেহাদিদের সমর্থক নন। নির্বাচনে জনতা জামায়াতে ইসলামিকে প্রত্যাখ্যান করিলেও তাহারা কিন্তু প্রধান বিরোধী দল রূপে উঠিয়া আসিয়াছে। ইহা ভারত ও বাংলাদেশ দুই দেশের পক্ষেই একটি অশনিসংকেত। কেননা, জামাতিরা ভারত সীমান্ত এলাকাগুলিতেই শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছে। এই কঠিন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশকে বিশ্ব সভায় সভ্য জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করিতে তারেক রহমানকে সদিচ্ছার প্রমাণ রাখিতে হইবে। তাঁহাকে নিশ্চিত করিতে হইবে যে, বাংলাদেশে আর হিন্দু সমাজ তথা সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার সংঘটিত হইবে না। তাহার সহিত বিনা দোষে দণ্ডিত সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাস প্রভুকে নিঃশর্ত মুক্তি প্রদান করিয়া তাঁহাকে প্রমাণ করিতে হইবে যে তিনি মোল্লাবাদী ও জেহাদিদের পক্ষে নহেন। বিশ্বসভায় বাংলাদেশের যে ভাবমূর্তি ম্লান হইয়া গিয়াছে তাহা তাঁহাকে পুনরুদ্ধার করিতেই হইবে। তাহা না হইলে বাংলাদেশও বিশ্ববাসীর নিকট একটি সন্ত্রাসী দেশ হিসাবেই চিহ্নিত হইয়া থাকিবে।

সুভাষিতম্

উপকারান্ স্মরেন্নিত্যম্ অপকারাংশ্চ বিস্মরেৎ।
শুভে শৈঘ্র্যং প্রকুর্বীত অশুভে দীর্ঘসূত্রতা।।

কারও দ্বারা উপকারকে সর্বদা মনে করতে হয় এবং অপকারকে খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যেতে হয়। সেরকমই কোনো শুভ কাজ খুব তাড়াতাড়ি করে ফেলতে এবং অশুভ কাজের জন্য কালক্ষেপ করতে হয়।

‘না আঁচালে বিশ্বাস নেই’ হলো দুর্বল আর মেরুদণ্ডহীনের ভাষা

থাপ্পড়

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

নীতিগত বিষয় তৃণমূল সরকার পর পর থাপ্পড় খাচ্ছে। ব্যর্থতা আর তৃণমূলি মুখ্যমন্ত্রী এখন সমার্থক শব্দ। ‘এসআইআর’ নিয়ে তৃণমূলনেত্রীর চূড়ান্ত ল্যাজে গোবরে অবস্থা। ওয়াকফ আর সিএএ নিয়েও এক দশা। কোনোটাই তিনি আটকাতে পারেননি । সব রাস্তায় ব্যর্থ হয়ে ৬ মার্চ থেকে ধরনায় বসছেন। একসময়ের পলাতক পুলিশকর্তা রাজীব কুমারকে বাঁচাতে ধরনা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এখন নিজের মান বাঁচাতে পথে নেমেছেন। রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপির দাবি, চুরির পুরস্কার দিতে কুমারকে রাজ্যসভায় পাঠিয়ে সংসদ সদস্যপদকে কালিমালিপ্ত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে যদি ১ কোটি ভুয়ো ভোটার ধরা পড়ে তাহলে ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রায় ৩৪ হাজার করে গড়ে নাম বাদ যাবে। এরপর যদি ধরে নেওয়া হয় যে, প্রতিটি কেন্দ্রে গড়ে প্রায় ২ লক্ষ করে ভোটার রয়েছে, তাহলে এ রাজ্যে নাম বাদের সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ১৭ শতাংশ।

কংগ্রেসে থাকার সময় থেকেই নাটক আর চমক দেওয়ার রাজনীতি করেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী। সেই চমক, নাটকের রাজনীতি তিনি এখনও টিকিয়ে রেখেছেন যদিও জানেন সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে তা বাতিল। বাঙ্গালি আবেগপ্রবণ জাতি। গত ১০ বছর ধরে তার ফয়দা তুলছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী। পরামর্শদাতার সুপারিশে ২০২১ সালে ভাতা দেওয়ার ভাঁওতাবাজির শুরু করেন তৃণমূলনেত্রী। ২০২৬-এর ভোটে তার নতুন চমক ‘যুবসাথী’। যুবকদের স্থায়ী কাজের বদলে ভাতা। সুপ্রিম আদালত জানিয়েছে এই ভাতার রাজনীতি সারা দেশে কাজ বা চাকরি করার প্রবণতা কমিয়ে দিচ্ছে। যুব সম্প্রদায়কে অলস করে তুলছে। হয়তো শীঘ্রই তা বন্ধের নির্দেশ জারি হবে। যেমন, নির্বাচনী বন্ড।

নাটক করেই ২০১৬-র পর থেকে মুখ্যমন্ত্রিত্ব চালিয়ে যাচ্ছেন তৃণমূলনেত্রী। এই রাজ্যে ভুয়ো ভোটারের সংখ্যা যে এতটা বাড়তে পারে তা প্রথমটায় বোঝা যায়নি। মনে হচ্ছে ‘এসআইআর’-এর চূড়ান্ত তালিকায় প্রায় ১৬-১৭ শতাংশ ভোটারের নাম বাদ যাবে। শোনা যাচ্ছে যে, পলাতকা তৃণমূলনেত্রী এবার নাকি বন্দর এলাকা থেকে ভোট লড়বেন। নিজের কেন্দ্র ভবানীপুর থেকে তার দলের মুসলমান নেতা ফিরহাদ হাকিমের কন্যা প্রার্থী হবেন। নেত্রীর ভাইপো, সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি হাকিমের বিরোধী ক্যাম্প। তাকে গাল না দিয়ে তিনি জল খান না। হাকিমের মেয়র হওয়ায় অনুষ্ঠান বয়কট করে দিল্লি চলে গিয়েছিলেন অভিষেক। তাঁর প্রিয় বিধায়ক বাবুল সুপ্রিয়কে বালিগঞ্জ থেকে সরিয়ে অশীতিপর শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে সেখানে নিয়ে আসার জন্য তৃণমূলত্রীকে হাকিম প্ররোচনা দিচ্ছেন। আর ‘ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে’ অবস্থা নিরীহ দেবাশিস কুমারের। জয় করায়ত্ত ধরে নিয়েও স্বপ্নের মধ্যে চমকে চমকে উঠছেন যদি হেরে যান। রাসবিহারী কেন্দ্রে তিনি তৃণমূলের ‘ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো’। ২০০০ আর ২০০৫-এ কলকাতা পুর ভোটে দেবাশিস-বাবুকে হারাতে গিয়ে কাল ঘাম ছুটে গিয়েছিল তৃণমূলনেত্রীর। কিন্তু হারাতে পারেননি। দেবাশিস তৃণমূলের শুভেন্দু অধিকারী হয়েই থেকে গিয়েছেন। হাকিমের কন্যাকে ভবানীপুর থেকে হারাতে পারলে অভিষেকবাবুর অভীষ্ট খানিকটা পূর্ণ হবে বলে অনেকের ধারণা। মুখ্যমন্ত্রী হাকিমকে রাজ্যে রাখতে চান না এমন একটা ধারণা তৈরি হয়েছে। পালিয়ে যাওয়া হলো তৃণমূলনেত্রীর রাজনৈতিক বৃত্তি । ১৯৮৯-এ যাদবপুর থেকে দক্ষিণ কলকাতা তারপর ২০২১-এ নন্দীগ্রাম থেকে ভবানীপুর আর ২০২৬-এ ভবানীপুর থেকে বন্দর এলাকা। এসআইআর-এর ধাক্কায় কলকাতা বন্দর বিধানসভা কেন্দ্রে এক বিরাট সংখ্যার ভোটার কমেছে। ইরানের মোল্লাবাদী নেতা আয়াতোল্লা খোমেইনিকে খতম করে ‘সাপের মাথা কেটেছি’ বলে দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই রাজ্যেও বিজেপি তৃণমূলনেত্রীকে ‘সাপের মাথা’ ঠাউরে ২০২৬-এর ভোট লড়তে যাচ্ছে। পরের মাসে প্রমাণ হবে সাপ ছোবল মারবে, না তার মাথা কাটা যাবে। ক্ষমতায় এসে বিদেশি বামেদের দশ বছর চুপ করে থাকতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। বামেদের কিছু যুব নেতা তাকে জেতাতে সান্ধ্য চ্যানেলে তৃণমূল সেজে গিয়েছেন। অথচ তাদের নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে গিয়েছে। তৃণমূল শাসনের পরিবর্তনের আসন্ন ক্ষেত্র তৈরি হলেও রাজ্যের মানুষ শেষ দু’বার তৃণমূলি শাসন ফিরে আসায় অনেকটাই হতাশ। তাঁরা বিশ্বাস করতে পারছেন না যে, হারতে পারেন তৃণমূলনেত্রী। রাজ্যবাসীকে এই ‘না আঁচালে বিশ্বাস নেই’ গোছের ধারণা ছাড়তে হবে । আহারটাই আসল আঁচানোটা নয়। বাঙ্গালি যদি তার মেরুদণ্ড বাজি রেখে সেই আহার গ্রহণ করে তাহলে তাকে আর আঁচানোর কথা ভাবতে হবে না। জয় হবেই।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

ভবানীপুর ভয়ঙ্কর

ভীতগ্রস্তেষু দিদি,

আজকের চিঠির হেডলাইনটা লেখার সময়ে জটায়ুর কথা মনে পড়ল। এমন বইয়ের নাম শুনলে ফেলুদা কী বলতে কে জানে! তবে দিদি, জ্ঞানেশদা মানে আমাদের দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার, যাঁকে আপনি কথায় কথায় জ্ঞান দিয়েছেন তিনি কিন্তু খেলা দেখিয়ে দিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গের এসআইআরের প্রথম দফার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। প্রথম দফার চূড়ান্ত তালিকা থেকে আপাতত বাদ গেল ৫ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫৩ জনের নাম। ঝুলে রইল ৬০ লাখ ৬ হাজারের নাম। আর তাতে আবার দিদি সবচেয়ে বড় ভয় ভবানীপুরে। ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক আসন।

খসড়া তালিকায় নাম ছিল ৭ কোটি ৮ লক্ষ ১৬ হাজার ৬৩০ জনের। প্রথমেই বাদ পড়েছিল ৫৮ লক্ষ ২০ হাজার ৮৯৯ জন। ফলে সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত বাদের হিসাব দাঁড়াল ৬৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ৯৫২ জনে। ৬ নম্বর ফর্মের মাধ্যমে নতুন নাম যুক্ত হয়েছে ১ লক্ষ ৮২ হাজার ৩৬ জনের। ৮ নম্বর ফর্মের মাধ্যমে নাম যুক্ত হয়েছে ৬ হাজার ৬৭১ জনের। শনিবার প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, রাজ্যের মোট ভোটার সংখ্যা ৭ কোটি ৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ২৮৪। তার মধ্যে ৬০ লক্ষ ৬ হাজার ৬৭৫ জনের নাম এখনও বিবেচনাধীন পর্যায়ে রয়েছে। যা বিবেচনা করছেন বিচারকেরা। এর মধ্যে থেকে আরও কিছু নাম বাদ যেতে পারে। এটাই তো বিপদ।

দিদি, এসআইআর প্রক্রিয়া শুরুর সময় কমিশন জানিয়েছিল, আপনার কেন্দ্র ভবানীপুরে মোট ভোটারের সংখ্যা ২ লক্ষ ৬ হাজার ২৯৫। গত ১৬ ডিসেম্বর খসড়া তালিকা প্রকাশের পর দেখা যায়, ৪৪ হাজার ৭৮৬ জনের নাম বাদ পড়েছে। এবার চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় আরও ২ হাজার ৩২৪ জনের নাম বাদ পড়ল। সব মিলিয়ে ভবানীপুর কেন্দ্রে বাদ পড়েছে ৪৭ হাজার ৯৪ জনের নাম। শুধু ৪৭ হাজার নাম বাদ নয়, ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে আরও ১৪ হাজার ১৫৪ জনের নাম অমীমাংসিত তালিকায় রয়েছে। এর অর্ধেক থাকবে না ধরে নিলে বাদ দাঁড়াচ্ছে ৫৪ হাজার। গত বিধানসভা নির্বাচনে ভবানীপুরে তৃণমূল জিতেছিল, ২৮, ৭১৯ ভোটে। পরে আপনি উপনির্বাচনে জিতেছিলেন, ৫৮,৮৩৫ ভোটে। তবে সেটা তো উপনির্বাচন। ২০১৬ সালে আপনি জিতেছিলেন ২৫,৩০১ ভোটে। তাই ধরা যেতে পারে সাধারণ ভোটে ভবানীপুরে আপনি মোটামুটি ২৫ থেকে ২৮ হাজার ভোটে জেতেন। তার দ্বিগুণ ভোটার বাদ যাওয়া মানে অঙ্কটা আপনিই করে নিন। 'অমীমাংসিত' রয়েছে ১৪ হাজার ১৫৪ জনের পরিচয় তো আর জানা যাচ্ছে না। তাই চিন্তা দিদি। আমার চিন্তা হচ্ছে, এদের বড়ো অংশ দুধেল গাই নয় তো!

আরও অনেক ভয় পাচ্ছি দিদি। দেখা যাচ্ছে বিবচনাধীন ৬০ লক্ষ ৬ হাজার ৬৭৫ জনের মধ্যে ২৪ লক্ষ নাম রয়েছে তিনটি জেলায়। মুর্শিদাবাদ, মালদহ এবং উত্তর দিনাজপুর। ঘটনাচক্রে এই তিনটি জেলাই সংখ্যালঘু অধ্যুষিত। যে অংশ আপনার দল তৃণমূলের ভোটের অন্যতম ভিত্তি।

মুর্শিদাবাদে বিবেচনাধীন রয়েছে ১১ লক্ষ ১ হাজার ১৪৫ জনের নাম। মালদহে সংখ্যাটা ৮ লক্ষ ২৮ হাজার ১২৭। আর উত্তর দিনাজপুরে ৪ লক্ষ ৮০ হাজার ৩৪১। এই তিন জেলায় মোট বিবেচনাধীনের সংখ্যা ২৪ লক্ষ ৯ হাজার ৬১৩। এ ছাড়াও দুই ২৪ পরগনাতেও বিপুল সংখ্যক মানুষের নাম রয়েছে কমিশনের আতশকাচের তলায়। উত্তর ২৪ পরগনায় বিবেচনাধীন রয়েছে ৫ লক্ষ ৯১ হাজার ২৫২ এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৫ লক্ষ ২২ হাজার ৪২। দুই ২৪ পরগনার বিবেচনাধীন ভোটার সংখ্যা ১১ লক্ষ ১৩ হাজার ২৯৪। অর্থাৎ এই পাঁচটি জেলায় যে পরিমাণ নাম বিবেচনাধীন তালিকায় রয়েছে, তা মোট নামের ৫০ শতাংশের বেশি। দিদি, অতীতের হিসেব বলছে, উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ মহকুমা বাদ দিয়ে প্রায় সর্বত্রই তৃণমূল শক্তিশালী। আবার গোটা দক্ষিণ ২৪ পরগনাই কার্যত আপনার দলের দখলে। কেবল গত বিধানসভা নির্বাচনে ভাঙড় যেন বিচ্ছিন্ন এক দ্বীপ।

যা দেখছি দিদি, তাতে আপনার শক্তিশালী দুর্গেই ৫০ শতাংশের বেশি নাম বিবেচনাধীন তালিকায় রাখা হয়েছে। এরা না থাকলে কে আর জেতাবে দিদি!

পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তনের প্যারাডক্স

ড. আত্রেয়ী সাহা

২০১১ সালে টানা ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট সরকারের অবসানের পর পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে 'পরিবর্তন' শব্দটি হয়ে উঠেছিল সবচেয়ে জনপ্রিয় স্লোগান। মনে করা হয়েছিল, নতুন সরকার রাজ্যকে এক নতুন জীবনের দিশা দেখাবে। উন্নয়নের ঘাটতি, পরিকাঠামোগত দুর্বলতা, নিয়োগ ও বেতন বৃদ্ধি সংক্রান্ত সমস্যা, শিক্ষাক্ষেত্রের উন্নয়ন— এই সব বিষয়ই গুরুত্ব পাবে বলে আশা করা হয়েছিল। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প ও টাটা মোটরসের গাড়ি কারখানা স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে যে জনরোষ সৃষ্টি হয়েছিল, সেটিই তখনকার বিরোধী দলের কাছে নির্বাচনে জয়ের প্রধান ইস্যু হয়ে ওঠে। যদিও এই আন্দোলন তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ ছিল, সামগ্রিকভাবে রাজ্যের জন্য তা অভিশাপে পরিণত হয়। ২০১১ সালের পর থেকে অধিকাংশ বিনিয়োগকারী পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

২০১১ সালের ১ এপ্রিল থেকে ২০২৫ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত দুর্বল পরিকাঠামো, দুর্বল জমি অধিগ্রহণ নীতি এবং স্থানীয় দুষ্কৃতীদের দ্বারা 'কাট মানি'-র মাধ্যমে ব্যাপক চাঁদাবাজির কারণে মোট ৬,৬৮৮টি কোম্পানি রাজ্য ছেড়ে চলে গেছে। শুধু ২০১৯-২০২৪ সময়কালের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ থেকে ২,২০০টি কোম্পানি সরে গেছে। ১৯৭০-এর দশকে নিবন্ধিত কোম্পানির সংখ্যার বিচারে পশ্চিমবঙ্গ ছিল মহারাষ্ট্রের পরেই দ্বিতীয় স্থানে (তথ্যসূত্র ঃ ইকোনমিক টাইমস্, ২০২৪)। এর মধ্যে অধিকাংশ কোম্পানি ২০১৭-১৮ সময়কালে রাজ্য ছেড়ে মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ ও দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয়। নীতি আয়োগ রিপোর্ট (২০২৫) অনুযায়ী, রাজ্যের বার্ষিক বেকারত্বের হার ২.২ শতাংশ, মহিলা শ্রমশক্তির অংশগ্রহণের হার ৩৩.৮ শতাংশ, যা জাতীয় গড়ের চেয়ে কম এবং মাথাপিছু আয় জাতীয় গড়ের তুলনায় ২০ শতাংশ কম।

২০২২-২৩ সালে রাজ্যের জনঋণ ও মোট রাজ্য অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিএসডিপি) অনুপাত ছিল ৩৮.৪ শতাংশ, যা একটি মধ্যম মানের রাজ্যের তুলনায় বেশি। কর্মরত জনসংখ্যার একটি বড়ো অংশ উৎপাদন, কৃষি, বনজ, মৎস্য ও নির্মাণ খাতের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে কোম্পানির স্থানান্তর, কারখানা বন্ধ হওয়া এবং শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ হ্রাস এই কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রগুলোকেও মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করেছে। ২০১২-১৩ থেকে ২০২১-২৩ এই দশকে মোট গ্রস স্টেট ভ্যালু অ্যাডেড (জিএসভিএ)-এ কৃষি খাতের অংশ ৩.১ শতাংশ কমেছে, শিল্প খাতের অংশ কমেছে ১.২ শতাংশ, উৎপাদন খাতে মাত্র ০.৩ শতাংশ সামান্য বৃদ্ধি হয়েছে এবং নির্মাণ খাতের অংশও ০.৫ শতাংশ কমেছে। শিল্পক্ষেত্রের পাশাপাশি শিক্ষা ও ক্ষমতায়নও সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগে একের পর এক দুর্নীতি, স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলাবিধির অভাব— এসবই রাজ্যের শিক্ষাগত ভবিষ্যৎকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। নীতি আয়োগ রিপোর্ট (২০২৫) অনুযায়ী, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ২০০৬-০৭ থেকে ২০১৬-১৭ সময়কালে ২৫ শতাংশ কমেছে; উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই অনুপাত ২০১২, ১৩ থেকে ২০১৬-১৭ সময়কালে ১২ শতাংশ কমেছে এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৮-১৯ সময়কালে ৬ শতাংশ কমেছে। ২০২২-২৩ সালে স্কুলছুটের হার ছিল ছেলেদের ক্ষেত্রে ৬.৬ শতাংশ এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ৪ শতাংশ। কিন্তু ২০২৪-২৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ছেলেদের ক্ষেত্রে ২৩ শতাংশ এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৭.৮ শতাংশ। নবম ও দ্বাদশ শ্রেণিতে পৌঁছনোর পর রাজ্যের প্রতি পাঁচজন শিক্ষার্থীর একজন স্কুল ছেড়ে দেয় ভবিষ্যৎ ও কর্মসংস্থানের অভাবে। একসময় শিক্ষা ও সংস্কারের পীঠস্থান হিসেবে পরিচিত পশ্চিমবঙ্গের জন্য এই ভয়াবহ পশ্চাদপসরণ অত্যন্ত উদ্বেগজনক। যে রাজ্য একসময় বহু মহান সমাজ সংস্কারকের জন্মভূমি ছিল, সেই রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার এই অবস্থা ভবিষ্যতের জন্য গভীর অশনিসংকেত বহন করে।

অন্যদিকে, বিভিন্ন দুর্নীতিও বেড়েই চলেছে। সারদা গ্রুপ ও রোজ ভ্যালির মতো চিটফান্ড কেলেঙ্কারি (২০০৫-১৩), ২০১৬ সালে প্রকাশ্যে আসা স্কুল শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারি— যা এখনও বিচারাধীন এবং বহু শিক্ষকের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে রেখেছে, ২০২২ সালে প্রকাশিত কয়লা ও মানি লন্ডারিং কেলেঙ্কারি এবং ২০২৫ সালের আসানসোল আর্থিক কেলেঙ্কারি; সবকটিই এখনও বিচারাধীন। এই কেলেঙ্কারিগুলি বারবার প্রশ্ন তুলে দিয়েছে ২০১১ সালে বাঙ্গালি যে 'পরিবর্তন'-এর স্বপ্ন দেখেছিল, তার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ক্রমবর্ধমান স্কুলছুট, হতাশাজনক অর্থনৈতিক নীতি এবং রাজ্যের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিয়ে গভীর উদ্বেগ। ২০২২ সালে নদীয়া জেলার হাঁসখালিতে ১৪ বছরের এক কিশোরীর ধর্ষণ মামলা, ২০২৬ সালে কলকাতায় ৩১ বছরের এক স্নাতকোত্তর মেডিক্যাল ছাত্রীর ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ড, একই বছরে কলকাতার এক আইন কলেজে এক আইন পড়ুয়ার ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ড এবং ২০২৬ সালে হুগলি জেলার পরিত্যক্ত এক কারখানায় এক মেয়ের গণধর্ষণের ঘটনা এসবই সরকারের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা ব্যবস্থার ঘাটতির ভয়াবহ উদাহরণ।

এখন সময় এসেছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের 'পরিবর্তন'-এর ধারণা নতুন করে ভাবা ও সংজ্ঞায়িত করার। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন রাজ্যের মানুষের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ। এই নির্বাচন রাজ্যের ভবিষ্যৎ গড়তেও পারে, আবার ভেঙেও দিতে পারে। তাই মানুষের জন্য অত্যন্ত জরুরি একটি বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত নেওয়া; এমন একটি বিকল্প বেছে নেওয়া, যা রাজ্যের জন্য একটি ফলপ্রসূ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে পারে। মানুষকেই ঠিক করতে হবে; শুধু বিনামূল্যের সুবিধার উপর নির্ভর করে উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও সন্তানদের নিরাপত্তার সঙ্গে আপোস করবে কী না, নাকি হতাশা ও দুর্নীতিতে জর্জরিত রাজ্যে সত্যিকারের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনবে।

(লেখিকা জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপিকা)

দাড়ি-টুপি-আলখাল্লা আজরাইল দাঁড়িপাল্লা

সুভাষ চক্রবর্তী

অন্ধকারের পথযাত্রী বাংলাদেশ। সামনে-পিছনে, ডান-বাম দিকে কোনো দিকেই আলোর সন্ধান নেই দেশটিতে। ক্ষীণ আলোর দিশা দিতে যারা প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তারা ব্রাত্য। শত্রু এখন ভ্রাতা। শোষক এখন সমাজসেবী। জেহাদ, সাম্প্রদায়িকতা তাদের অভ্যাস। দুর্নীতি জন্মসিদ্ধ অধিকার। আইনের শাসন কাঁচকলা। সন্ত্রাস লাভজনক ব্যবসা। রাজনৈতিক নেতারা কেউ মার্কিন, চীন, পাকিস্তানপন্থী। প্রশ্ন জাগে, বাংলাদেশে বাংলাদেশপন্থী মানুষ কোথায়? দরিদ্র সাধারণ মানুষই বাংলাদেশপন্থী। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অক্লান্ত শ্রম দিয়ে তারা দেশ গড়তে উৎসাহী।

রাজনৈতিক ও মোল্লাবাদী সন্ত্রাসে তাদের আনন্দ হাওয়ায় মিলে গেছে। এই অসহায় মানুষদের দেখার অথবা কথা শোনার কেউ নেই। কৃষি প্রধান বাংলাদেশে ভাত জোটে না মানুষের। শিল্প একমাত্র বস্ত্র শিল্প। উৎপাদন পাইকারি হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি। দেড়লক্ষ কিলোমিটার আয়তনের বাংলাদেশ জনভারে বিধ্বস্ত। দেশে নেই কর্মসংস্থান। অনিয়ন্ত্রিত হারে চলছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি । অসহিষ্ণুতা,উগ্রতা তাদের হাতিয়ার। মাজার, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা তাদের লক্ষ্যস্থল। হিন্দুদের প্রতি তাদের তীব্র ঘৃণা,বিদ্বেষ। বাউল, সাধক, সন্ন্যাসী হারাম। এরই নাম স্বাধীন বাংলাদেশ। স্বাধীনতা ভোগ করতে গেলে ঐক্য ও শান্তি প্রয়োজন। বাংলাদেশি ইমানদাররা এসবের পরিপন্থী কাজে উল্লসিত। ১৯৪৬ সালে নোয়াখালী ও কলকাতায় একতরফা হিন্দু নরসংহার শুরু হয়েছিল। তার ধারাবাহিকতা আজও বিদ্যমান। হিন্দু ও ভারতবিদ্বেষ মূলধন করে চলেছিল ত্রাস সৃষ্টি। ১৯৪৭ সালে ১৪ আগস্ট সেই ত্রাসেই জন্ম হয়েছে পাকিস্তান। ভাগ হয়েছে ভারতবর্ষ। ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর ভারতের হাত ধরে পূর্ব পাকিস্তান আত্মপ্রকাশ করেছিল স্বাধীন বাংলাদেশ। মুক্তিযুদ্ধে শেখ মুজিবুর রহমান, মেজর জিয়াউর রহমান, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদের ভূমিকার ব্যাপারে ইতিহাস সাক্ষী রয়েছে। সঙ্গে ছিল আত্মত্যাগী অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধারা। পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষ। ভারতীয় জনসাধারণ, বীর সেনা ও সীমান্ত রক্ষী বাহিনী।

১৯৭২ সালে ১০ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের জেল থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরে এলেন মুজিবুর রহমান। মুক্তি বাহিনীর নিরস্ত্রকরণে সক্রিয় হয়ে উঠলেন তিনি। মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানের শেষ বীজ বাংলাদেশের মাটি থেকে নির্মূল করতে ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত অস্ত্র কাছে রাখতে চেয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত শেখ মুজিবুরের চাপে তারা অস্ত্র জমা দিতে বাধ্য হলেন। এরপরই নিরস্ত্র মুক্তিযোদ্ধারা স্বাধীন দেশের মাটিতে নির্মম হত্যার শিকার হলেন জামায়াতিদের হাতে। সংখ্যাটা কয়েক হাজার তো হবেই। কৌশলে ভারতীয় সেনা বাংলাদেশের মাটি থেকে প্রত্যাহার করাতে চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন মুজিবুর। ইসলামি সন্ত্রাসবাদীদের আর্থিক মদতদাতা রাবেয়াতেই ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশের মাটিতে স্থাপনের অনুমোদন দান করলেন মুজিবুর রহমান। মুক্তিযোদ্ধাদের আশা ছিল তাদের নিয়ে দেশের সেনাবাহিনী গঠন করা হবে। ফল হলো উলটো। পাকিস্তান ফেরত সেনাদের নিয়ে গঠন করা হলো বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। এরা ছিল কট্টর ভারত বিরোধী। ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্র ১২শো বছরের প্রাচীন ৮০ ফুট উঁচু রমনা কালীমন্দির। পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণে ১৯৭১ সালে ২৭ মার্চ তিন ফুটের মতো বিধ্বস্ত হয়েছিল। নিহত হয়েছিলেন শতাধিক ভক্ত। মুজিবের নির্দেশে বুলডোজার দিয়ে নিশ্চিহ্ন করা হলো এই প্রাচীন মন্দির ও কোটি-কোটি হিন্দুর শ্রদ্ধাকেন্দ্র। মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তি ২২ একর জমি জবরদখল করে সুরাবর্দি পার্ক ও গ্লাস টাওয়ার নির্মাণ করা হলো। আত্মগোপনে থাকা আল বদর, রাজাকার, জামায়াত, পাকিস্তানপন্থীরা ১৯৭২ সালে দুর্গাপূজার সময় বাংলাদেশের ৩ হাজার দুর্গাপ্রতিমা ভেঙে ফেলে তাদের উপস্থিতি ও শক্তির প্রমাণ দিল। নতুনভাবে বাংলাদেশের হিন্দুর ১ লক্ষ ৬২ হাজার একর জমি শত্রু সম্পত্তি তালিকাভুক্ত করা হলো। ঢাকার সন্নিকটে সাবার নামক স্থানে স্কুল প্রাচীরে পোস্টার লাগিয়ে স্লোগান দেওয়া হলো— 'মুজিব যদি বাঁচতে চাও ইন্দিরাকে তালাক দাও'।

জামাতিরা গত ৫৬ বছর নীরবে বংশবিস্তার করে গিয়েছে বাংলাদেশের মাটিতে। ইউনুস শাসনের আড়ালে তারা অস্ত্র সংগ্রহ করে পেশীবল বৃদ্ধি করেছে। ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে প্রশাসনের গোপন সহযোগিতায় তারা ৩১ শতাংশ ভোট অর্জন করেছে। সংসদে বিরোধীদল হিসেবে প্রবেশ করেছে। তাদের আসন সংখ্যা এক লাফে ৭৬ দাঁড়িয়েছে। আগামীতে তারা ক্ষমতা দখল করবে এতে কোনো সন্দেহ নাই। জামায়াতি কালচারে বাংলাদেশে সর্বত্র বোরখা, দাড়ি, টুপি, আলখাল্লা শোভা পাচ্ছে। জামায়াতিরা দেশের বিভিন্ন স্থানে সরাসরি প্রগতিশীল মানুষদের উপর হামলা চালাচ্ছে। আগামীদিনে এই জেহাদি প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে বলে মানুষ শঙ্কিত। জামায়াতি আগ্রাসনে তারেক রহমান সরকারের হঠাৎ অঘটন ঘটলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। জিয়াউর রহমানের ছেলে তারেক রহমান দীর্ঘ সতেরো বছর লন্ডনে নির্বাসিত জীবনযাপন শেষে দেশে ফিরেছেন। তার দল নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। দেশ পরিচালনার প্রধান কাণ্ডারি হিসাবে তারেক এখন প্রধানমন্ত্রী। জ্ঞান ভাণ্ডারে সঞ্চিত সম্পদ দিয়ে তিনি নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখছেন। কতটুকু সম্ভব হবে তা সময়ই বলবে। কারণ বাংলাদেশে জেহাদি শক্তি বর্তমানে প্রবল।

শেখ হাসিনা সরকার অতি গোপনে বাধ্য হয়েছিলেন এই শক্তির সঙ্গে গোপন আঁতাত করতে। তবু তিনি মোল্লাতন্ত্রের শিকার হয়ে দেশত্যাগী হয়েছেন। স্বাধীনতার সময় বিষ বৃক্ষের বীজ নির্মূল করা উচিত ছিল। মুজিবুরের ভ্রান্ত নীতির কারণে তা সম্ভব হয়নি। সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে বিষ বৃক্ষের শিকড়। এরই প্রকাশ দাড়ি-টুপি-আলখাল্লা। এরা ভারতে অনুপ্রবেশকারী ও জেহাদি রপ্তানি করে ভারত দখলের খোয়াব দেখছে। এদের নির্মূল না করতে পারলে বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্ত জেলাগুলিতে আজরাইলের দাঁড়িপাল্লা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে জামায়াতিরা। □

একদা কমিউনিস্ট নিধনকারী খোমেইনি আজ ভারতের কমিউনিস্টদের চোখে 'বন্ধু'

কার্ল মার্ক্স কমিউনিস্টদের শত্রুর ব্যাপারে অনেক কিছু বলে গিয়েছেন, কিন্তু কমিউনিস্টদের বন্ধুর ব্যাপারে তিনি ছিলেন একদম চুপ। তাই মার্ক্সবাদী যখন বন্ধু খোঁজে, তখন সেই শ্রেণীশত্রুর ফর্মুলায় বন্ধুর সন্ধান করে। অর্থাৎ শত্রুর শত্রু হলে তবেই মিত্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-স্থিত গ্লোবাল ডিপ স্টেট বিশ্বজুড়ে কমিউনিস্টদের গোপন মদতদাতা হলেও পুঁজিবাদী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হলো কমিউনিস্টদের ঘোষিত শত্রু। সেই ফর্মুলায় শত্রু আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো খোমেইনি হলো কমিউনিস্টদের বন্ধু। এই তত্ত্ব অনুযায়ী পি সি জোশীর কাছে নেতাজী সুভাষচন্দ্র হলেন শত্রু। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন মিত্রশক্তির জোটে শামিল হন স্তালিন। ব্রিটেন-আমেরিকা নেতৃত্বাধীন মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন নেতাজী। এ কারণে নেতাজী ছিলেন কমিউনিস্টদের চোখে শ্রেণীশত্রু। এখানে একজন ব্যক্তি কারুর কাছে কতটা প্রিয় সেটা বিবেচনা করার কোনো প্রয়োজন নেই। মার্ক্সবাদী তত্ত্ব (যা একেবারেই কোনো দর্শন নয়) বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া থেকে উদ্ভূত এক অদ্ভুত পথ। যার ক্রিয়াগুলি হলো বিভিন্ন আব্রাহামিক নিয়ম-কানুন। এই তত্ত্বতে কোনো মৌলিক উপলব্ধি নেই। মানুষ কতরকম হয়, কতভাবে চিন্তা করে, কীভাবে চিন্তা করে— এসবের কোনো প্রভাব মার্ক্সীয় তত্ত্বে নেই। মানুষ যে চিন্তা করতে পারে এবং সেই চিন্তা যে পরিবর্তনশীল সেটাই অগ্রাহ্য করে একজন মার্ক্সবাদী। আর এখানেই নিহিত রয়েছে মার্ক্সবাদের ব্যর্থতার বীজ। ইহুদি, খ্রিস্টান, ইসলাম— বিভিন্ন আব্রাহামিক রাজত্ব কখনও সফল হয়েছে, কখনও ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু দুনিয়া জুড়ে মার্ক্সবাদীদের একটাই পরিণতি। সেটা হলো— ব্যর্থতা।

মার্ক্সবাদীরা জানে যে, তাদের তত্ত্ব সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাই ক্ষমতায় এলে প্রথমে যে কাজটি তারা করে তা হলো মানুষের সবরকম মানবাধিকারকে অস্বীকার করা। এই কারণেই তাদের ব্যর্থতার গতি আরও বাড়তে থাকে। পাকিস্তান দেশটি সেনাবাহিনী ও মোল্লাতন্ত্রের কড়া নিয়ন্ত্রণে থাকার কারণে বড়ো মাপের বিদ্রোহ দেখা যায়নি ৭৯ বছর। যদিও একশ্রেণীর পাকিস্তানি বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মী সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সরব ছিলেন চিরকাল। বর্তমানে খাইবার, সিন্ধ, বালোচিস্তান, পাক অধিকৃত কাশ্মীর ও গিলগিট-বাল্টিস্তানে পাক সেনাবাহিনী গণবিদ্রোহের সম্মুখীন হচ্ছে। কিন্তু ইরাক, ইরান, লিবিয়া, সিরিয়া, মিশর, সুদানে কেন পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির মতো গণবিদ্রোহ হয়? কেন বাংলাদেশে শেখ মুজিবুর, এরশাদ বা শেখ হাসিনার শাসনকালে গণবিদ্রোহ হয়? কারণ মার্ক্সবাদীদের মতোই বাক্‌স্বাধীনতার ব্যাপারটা অস্বীকার করে বিভিন্ন দেশের ইসলামি শাসক বা মার্কিন, সোভিয়েত এজেন্টরা। ভারতেও শাসকের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জন-আন্দোলন একবারই হয়েছে, ১৯৭৭-এ। কারণ বলাই বাহুল্য।

এবার দেখা যাক দু'টো ঘটনায় কীভাবে কমিউনিস্টদের প্রতিক্রিয়া ভারতের কিছু নাগরিককে ভুল পথে চালিত করে। এক, ইরানের ইসলামিক বিপ্লব। দুই, আজাদ হিন্দ ফৌজ। খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস ভাণ্ডারের মতো বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ কবজা করার উদ্দেশ্যে গুপ্তচর সংস্থা সিআইএ-র মাধ্যমে আমেরিকা নানা কলকাঠি নাড়লেও ১৯৭৯ সালে ইরানের ইসলামিক বিপ্লব ঘটে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থে এবং ইরানের কমিউনিস্ট পার্টি এই 'বিপ্লব'কে সম্পূর্ণ সমর্থন করে। কিন্তু ক্ষমতায় এসে রুহুল্লা খোমেইনি দেশের সব লিবারেল, সোশ্যালিস্ট ও কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করে। এই পার্টিগুলির সদস্যদের বিচার হয়। বহু পার্টি মেম্বার দেশ ছেড়ে পালায়। বহু সদস্যের জেল হয় এবং সেখানেই তাদের মৃত্যু হয়। বহু কমিউনিস্ট নেতাকে ফাঁসি দেয় ইরানের ইসলামি শাসক। বহু নেতাকে ফায়ারিং স্কোয়াডে হত্যা করা হয়। ইরানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, নারী স্বাধীনতা— সবকিছুই শেষ হয়ে যায়। মেয়েদের বাধ্য করা হয় বোরখা ও হিজাব পরতে। সেদিন রাশিয়া, চীন বা পূর্ব ইউরোপের কোনো দেশ কিন্তু ইরানের কমিউনিস্টদের পাশে দাঁড়ায়নি। উলটে কমিউনিস্ট বিশ্বের প্রধান শত্রু আমেরিকার পালটা হিসেবে ইরাকের সঙ্গে হাত মেলায় প্রভাবশালী কমিউনিস্ট দেশগুলি। আজ এতদিন পরে যখন ইরানের এই বীভৎস ইসলামিক শাসন শেষের পথে, তখন তাদেরই কমরেডদের হত্যাকারী রুহুল্লা খোমেইনির উত্তরসূরী আয়াতোল্লা খোমেইনির পাশে দাঁড়িয়েছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি। ইরানের গত ৪৮ বছরের ইতিহাস এবং সে ব্যাপারে কমিউনিস্টদের প্রতিক্রিয়া প্রমাণ করে যে, কমিউনিস্টদের কাছে আপনজনের চেয়ে 'শত্রুর শত্রু' অনেক বেশি প্রিয়।

১৯৩০-এর পর থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত ব্রিটিশের বিরুদ্ধে কংগ্রেস কোনোরকম আন্দোলন না করার কারণে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ব্রিটিশকে ভারতছাড়া করতে দেশত্যাগী হন সুভাষচন্দ্র। প্রথমে জার্মানিতে যান এবং তারপর জাপান। কিন্তু জার্মানি যাওয়ার আগে তাঁর পরিকল্পনা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে কথা বলে, স্তালিনের সাহায্য নিয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন হিটলারের নেতৃত্বাধীন জার্মানি যখন সোভিয়েত রাশিয়াকে আক্রমণ করে, তখন ভারতের কমিউনিস্টরা শুরু করে প্রবল নেতাজী বিরোধিতা। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নেতাজী সমর্থকদের ওপর আক্রমণও করে তারা। এখানেও কাজ করে সেই এক চিন্তা। সোভিয়েত ছিল তাদের অভিভাবক। এছাড়াও তারও আগে নানা যুক্তি সহকারে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদকে সমর্থন করেছিলেন কার্ল মার্ক্স। সেই চশমায় কমিউনিস্টরা বিচার করে 'নেতাজী' বন্ধু না শত্রু।

পৃথিবীর প্রায় সব ইসলামি দেশে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ। সব কমিউনিস্ট দেশে ইসলামি আচরণও নিষিদ্ধ। ইরানের সাধারণ মানুষ খোমেইনির অত্যাচার থেকে মুক্তি চাইছে। অথচ ভারতের কমিউনিস্টদের এই অত্যাচারী, বর্বর, মধ্যযুগীয় মুসলমান শাসনের প্রতি ভীষণ দরদ! ভারতের বিভিন্ন মিডিয়া, বুদ্ধিজীবী ও অনুপ্রাণিত শিক্ষক-অধ্যাপক সংগঠন আগামী কয়েকদিন ধরে বোঝানো শুরু করবে যে, খোমেইনি ভারতের বন্ধু। তাদের ঘুরিয়ে প্রশ্ন করতে হবে যে, নারী স্বাধীনতা-বিরোধী, বাক্‌স্বাধীনতা-বিরোধী, গত ৬ মাসে ৩৫ হাজার সাধারণ মানুষকে হত্যা করা একজন জল্লাদ কোন তত্ত্ব, কোন দর্শন বা কোন সূত্রে ভারতবাসীর বন্ধু হতে পারে? আর কোন দর্শন, কোন তত্ত্ব, কোন সূত্র নেতাজীকে 'কুইসলিং' বানিয়েছিল সেদিন? ভারতীয় দর্শনে কোনোদিনই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না কমিউনিস্টরা। কারণ ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতিতে 'নীতি' ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রসঙ্গ : বাংলাদেশ

তারেক রহমান কি পারবেন চ্যালেঞ্জের পাহাড় উতরে যেতে?

ভারতের পক্ষে আশু কাজ হলো, ওপারে হিন্দুস্বার্থ রক্ষা করা, আর ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তকে গুরুত্ব দিয়ে সংরক্ষণ করা যাতে আর নতুন করে অনুপ্রবেশ না হয়। যাতে আর কোনোভাবেই জেহাদি সন্ত্রাস ভারতে সংঘটিত না হয়।

সুজিত রায়

এই তো সেদিনের ঘটনা।

অবাধে লুঠ চলছিল বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মুজিব-কন্যা শেখ হাসিনার বাসভবন গণভবন। যে যা পারছিল লুঠ করে মাথায় নিয়ে রাজপথ দিয়ে ছুটছিল উল্লাসে। তাতে কি না ছিল। খাট, বিছানা, টেবিল, টিভি রেফ্রিজারেটর, গিজার, কম্পিউটার, প্রিন্টার কিছুই বাদ ছিল না। ফুলগাছের টব, পর্দার কাপড় পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু ধৈর্যের বাঁধ ভেবেছিল যখন দেখা গেল চারচাকা গাড়ির মাথায় চেপে শেখ হাসিনার সন্তানসম তরুণেরা তাঁরই অন্তর্বাস নিয়ে সোল্লাসে পতাকার মতো ওড়াতে ওড়াতে ছুটছিল রাজধানী ঢাকার রাজপথে। খোলা আকাশের নীচে তখন 'দড়ি ধরে মারো টান রাজ্য হবে খান খান' আওয়াজ তুলে নব্যযুবকেরা ভাঙছিল বাংলাদেশ গঠনের মূল কারিগর মুজিবুর রহমানের প্রস্তরমূর্তি। ভাঙা হচ্ছিল তাঁর ৩২, ধানমুণ্ডির বাড়ি। টুকরো টুকরো করে মুছে দেওয়া হচ্ছিল মুক্তিযুদ্ধের সমস্ত নিশান। প্রথম দফার পর দ্বিতীয় দফায় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়া হলো 'ছায়ানট'— বঙ্গ সংস্কৃতির দেবালয়। ভাঙা হলো সংসদ ভবন। সেই সঙ্গে নির্বিচারে লাগামছাড়া জেহাদি সন্ত্রাসে গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো একের পর এক হিন্দু মন্দির। হিন্দু যুবক দীপুচন্দ্র দাসকে গাছে বেঁধে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করা হলো। সাক্ষী রইল উন্মত্ত হাজারো জেহাদি জনতা। কত হিন্দুর প্রাণ গেল, ঘর গেল, বসত জমি দখল হলো, চাষের জমি লুঠ হলো তার কোনো হিসেব মেলেনি। কোনোদিনই মেলেনি সেই স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময় থেকেই। বোঝা যাচ্ছিল মজহবি জেহাদ, পাকিস্তানি মদত আর চৈনিক উসকানি বাংলাদেশি জঙ্গি রাজনৈতিক সংগঠনের সলতে উসকে দিয়েছে। কিন্তু বিস্ময় ধরে রাখা যাচ্ছিল না, ১৩ ফেব্রুয়ারির দুপুরে যখন বাংলাদেশের দিকে দিকে শুরু হয়ে গেছে ভোটগ্রহণ। নিরুপদ্রব, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। পুলিশকে হাতের লাঠিও উঁচিয়ে ধরতে হয়নি। বন্দুক তো দূরের কথা। পরদিন ১৩ ফেব্রুয়ারি আরও বিস্ময় দিকে দিকে। ততক্ষণে মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেছে, দেশে গণতন্ত্রের পুনর্নবীকরণে মানুষের রায়দান জেহাদি শক্তির বিপক্ষেই গেছে। জয়ের পতাকা উঠেছে নতুন বিএনপি নেতা তারেক রহমানের হাতে। কিন্তু না, যে দেশের মাটি থেকে পালিয়ে বাঁচতে হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে, সেই দেশের মাটিতেই হাসিনা-বিরোধী বিএনপি-র নতুন হালধারী নায়ক তারেক রহমান ও তাঁর দলের ভূমিধস জয়ের পরেও বিজয় মিছিল বেরোয়নি একটাও।

রাতারাতি রাজপথ যেন খাঁ খাঁ ময়দান। জয় যেন পরিণত হয়েছে ঘরবন্দি ছুটির আমেজে। একি ম্যাজিক! *(সারণী দ্রষ্টব্য)*

ম্যাজিসিয়ান তারেক?

এক লহমায় তেমনই মনে হবে। পঁয়ত্রিশ বছর আগের প্রধানমন্ত্রী কাজি জাফর আহমেদ ছিলেন শেষ পুরুষ প্রধানমন্ত্রী। পরবর্তী বছরগুলো ছিল মহিলা জামানা। তারেক রহমানের মা খালেদা জিয়া, তারপর শেখ হাসিনার রাজমহল। তারেকের প্রথম কৃতিত্ব (?) এটাই— বাংলাদেশে আবার এক পুরুষ এলেন প্রধানমন্ত্রী পদে। সেটা তালিবানি জমানার সংকেতধ্বনি কিনা, সেটা এখনই বোঝা যাবে না। তবে ম্যাজিক তো বটেই। বাংলাদেশের রাজনীতির মঞ্চে তারেক রহমানের দ্বিতীয় ম্যাজিক ১৭ বছর দেশছাড়া হয়ে থাকার পরেও, এমনকী মা খালেদা জিয়ার সদ্য মৃত্যুর পরেও জঙ্গি জামাতি জমানার মুখে ছাই দিয়ে ২০৯ আসনে জয়ের মিছিলের ছবি এঁকে দেওয়া। অনেকে মনে করছেন, ১৯৮৪-র ৩১ অক্টোবর ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ গঠনের প্রকৃত রূপকার ইন্দিরা গান্ধীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর তাঁর সন্তান রাজীব গান্ধী যেমন সহানুভূতির ভোট-জোয়ারে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসেছিলেন, বাংলাদেশেও বুঝি তারেকও জিতে গেলেন সহানুভূতি ভোটেই। অনুমানটা একবোরে উড়িয়ে দেবার মতো না হলেও স্বীকার করতে হবে— পাশ্চাত্য রাজনীতির শিক্ষায় শিক্ষিত তারেক দেশে পা রেখেছিলেন তিনটি মন্ত্র সম্বল করে— ভেনি, ভিডি, ভিসি, (Veni, Vidi, Vici)— এলাম, দেখলাম এবং জয় করলাম— একেবারে সেই জুলিয়াস সিজারের খ্রিস্টপূর্বাব্দ ৪৭-এর বিখ্যাত উক্তির মতো। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরম্পরায় এতো ম্যাজিকই, কিন্তু সবটাই বুঝি ম্যাজিক নয়। মানুষের মনে ছিল অন্য অঙ্কও।

মানুষ কী চেয়েছিল?

২০২৫-এর জুলাইয়ের সেই জেহাদি উল্লাস যখন গোটা দেশের বুকে এঁকে দিয়েছিল দগদগে ঘা— তখন বাংলাদেশের বৃহত্তর অংশের মানুষ ছিলেন ঘরবন্দি। তাঁরা লজ্জায় দিনের আলোক থেকে ছিলেন অনেক

ফঃ ২

দূরে অসূর্যম্পশ্যা হয়ে। যন্ত্রণাটা আরও তীক্ষ্ণ হয়ে বিঁধেছিল যেদিন ধ্বংস হলো ছায়ানট। এ তো শুধু রাজনীতি নয়। এ তো সরাসরি সমগ্র বঙ্গের চিরকালীন পরম্পরা সংস্কৃতির ওপর আঘাত। সুযোগ এল সেদিন যেদিন তারেক বাংলাদেশে পা রাখলেন। সেদিন তিনি খোলা ময়দানে উদ্দীপ্ত জনতার সামনে ঘোষণা করলেন— বাংলাদেশকে তার পুরনো মাহাত্ম্যে ফিরিয়ে আনবেন। বছরের পর বছর ধরে অত্যাচার, অনাচার, দুর্নীতি, অপশাসন, স্বজনপোষণের চাবুকে জর্জর জনতা বোধহয় বেঁচে থাকার একটা আশ্বাসবাণী খুঁজে পেয়েছিলেন। আশায় বুক বেঁধেছিলেন— বাংলাদেশ আর যাই হোক— পাকিস্তান হবে না।

ফলত, ঘরবন্দি মানুষ যেমন সেদিন ছায়ানটের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে বঙ্গ সংস্কৃতিকে রক্ষার শপথ নিয়েছিলেন, তেমনই ভোটের দিন তাঁরা পথে নেমে এসেছেন লাখে লাখে। দিনভর আধা শীতের ওম গায়ে মেখেই ভোট দিয়েছেন নির্বিঘ্নে। বিশেষ করে মহিলারা। কারণ, তারেক রহমানের মতো তাঁরাও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন— এবারের ভোট শুধু জয়ের ছিল না, এটা ছিল ভোটাধিকারের ভোট, মানবাধিকারের ভোট, গণতন্ত্রের ভোট, নিজের ভোট নিজে দেওয়ার ভোট, বাংলাদেশের কপাল ভোট, মোল্লাবাদী শব্দটাকে মুছে দেওয়ার ভোট। এ ভোট শুধুই ক্ষমতা হস্তান্তরের ভোট ছিল না। তাই মানুষ অনেকটা এক তরফা ভোট দিয়েছেন। জয়ও এসেছে সেই হারেই। কিন্তু বাজি ফাটেনি, শহরকে মোড়া হয়নি আলোর মালায়। কোথাও ঝোলেনি ফেস্টুন, ব্যানার, হোর্ডিং। কোথাও ওঠেনি আবিরের ঝড়। মানুষ ধীর শান্ত মস্তিষ্কে জয়কে গ্রহণ করেছে। হয়তো শপথও নিয়েছে নতুন বাংলাদেশ গড়ার।

জামাতের আসন বাড়ল, বাড়ল আশঙ্কা

এত জয়— এমন মসৃণ পথে এল গণতন্ত্র। তবে জামাতের মতো বিধ্বংসী শক্তি যা তার নখ, তার দাঁত দেখিয়েছে কয়েক মাস আগেই, সে জামাতের আসনসংখ্যা ২০০২-এর ১৮ থেকে ৬৮ হলো কেন? কীভাবে? খুব সহজ উত্তর যেটা তা হলো গত ১৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে আওয়ামি লিগের দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের সরকার। নামেই গণতন্ত্র, আসলে আওয়ামি লিগও ছিল এক অর্থে ফ্যাসিস্ট শক্তিরই নামান্তর। মানুষের ক্ষোভ, বিক্ষোভ, অভাব-অভিযোগকে পুঁজি করে জামাতের মতো মানবাধিকার বিরোধী শক্তি নিজেকেই শক্তিশালী করে তুলেছে। জামাতের মূল লক্ষ্য— বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করা এবং ভারত-বিরোধিতাকে পূর্ণ রূপ দিতে ভারত-সংলগ্ন বাংলাদেশ সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে ঘাঁটি গাড়া। প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে জামাত এতদিন ধরে এই কাজটাই করে এসেছে এবং ফলও পেয়েছে।

প্রথমত, বাংলাদেশের বেকার এবং অলস মস্তিষ্কের যুবশক্তিকে ভারত ও হিন্দু বিরোধিতায় শামিল করানোয় জামাত অনেকটাই সফল হয়েছে। গত জুলাইয়ে জেহাদি আন্দোলন সেকথাই প্রমাণ করে। প্রমাণিত হয়েছে ভোটের অঙ্কেও। দেখা গেছে বাড়তি ৫০টি আসনের সিংহভাগই ভারত সীমান্তে— পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া, দক্ষিণ দিনাজপুর, কোচবিহার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলা সংলগ্ন বাংলাদেশের যশোহর, খুলনা প্রভৃতি জেলায় জয়ের আসন। এই সব জায়গায় বিএনপি তেমন সুবিধা করতে পারেনি। আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করা গেছে। তা হলো, জামাত দাঁত বসিয়েছে আওয়ামি লিগের বেশ কিছু শক্ত ঘাঁটিতে, যেমন লালফামারি, গোপালগঞ্জ, চাপাইনবাবগঞ্জ ইত্যাদি এলাকায়। অকাতরে গ্রামীণ মানুষের হাতে টাকা গুঁজে দিয়েছে খয়রাতির নামে আর বেহেশতের টিকিটের নামে। অশিক্ষিত চাষাভুষো পরিবারগুলির ভাবনার ওপর এইসব দান খয়রাতির প্রভাব পড়েছে সক্রিয়ভাবে। তাছাড়া হাসিনার দেশত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে মহম্মদ ইউনুস নামক এক অপদার্থ প্রশাসকের জমানায় ইসলামিক আবেগকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এর প্রত্যক্ষ ফল হলো হিন্দুদের ওপর জেহাদি সন্ত্রাসের হাজারো ঘটনা। এমনকী ওই ব্যাপারেও বহু উপদেষ্টাও প্রত্যক্ষভাবে মজহবি উসকানি এবং মাদ্রাসা-পুষ্ট জঙ্গিপনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। দেশের জেন-জি অর্থাৎ নয়া রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার সমর্থক গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণভাবে বিভ্রান্ত করেছে ন্যাশনাল সিটিজেন কমিটি বা এনসিপি। ঐতিহ্যাশ্রয়ী রাজনীতির বদলে নানা নতুন সংস্কারের নামে এই জাতীয় নাগরিক দল প্রকারান্তরে ইসলাম, জঙ্গিবাদ ও ভারত বিরোধিতারই জিগির তুলেছে। জামাত নানাভাবে এই দিগ্‌ভ্রান্ত যুবকদের কাজে লাগিয়েছে নিজেদের রাজনৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছতে।

তারেক রহমান এখন কী করবেন?

বাংলাদেশের নয়া প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বাংলাদেশে পা রেখেই যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেখানে তার অন্য সব বক্তব্যের মধ্যে অন্যতম ছিল দেশের সংখ্যালঘু সমাজ তথা হিন্দু জনগণের স্বার্থরক্ষা করা। শুনতে খুবই ভালো। কিন্তু ভারতের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বাংলাদেশ গঠিত হলেও, বাংলাদেশের হিন্দুরা নতুন দেশেও কখনোও শান্তিতে থাকেনি। ফলে অবাধে চলছে লুণ্ঠন, ধর্ষণ, দখল, বলপূর্বক হিন্দু নারীদের বিধর্মী পুরুষের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া, লাভ জেহাদের নামে হিন্দু তরুণীদের বশীভূত করা, ঘরদোর পুড়িয়ে দেওয়া, বাগান চাষের খেত, পুকুরের মাছ নষ্ট করে দেওয়ার মতো অবিরাম জেহাদি নিষ্পেশন। শেখ হাসিনার আমলেও তা থেকে হিন্দুদের রেহাই ছিল না। কারণ, তখনও বাংলাদেশ সাংবিধানিক ভাবে ইসলামিক দেশই ছিল। এর ফলে হিন্দু জনসংখ্যা কমতে কমতে এখন ৬ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। তার সঙ্গে অবিরাম উৎপাত সীমান্ত পেরিয়ে মুসলমানদের ভারতে অনুপ্রবেশ। মূল প্রবেশ দ্বার তিনটি— অসম, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গ। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রবেশ হয়েছে অসমে ও পশ্চিমবঙ্গে। তারপর তারা ছড়িয়ে পড়েছে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে। এমনকী উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, বিহার, রাজস্থান, গুজরাটের সম্পূর্ণ হিন্দু পরিবেষ্টিত অঞ্চলে অনেকেই হিন্দু নাম নিয়ে তারা 'ভারতবাসী' সেজে দিব্যি জমিয়ে বসেছে। ভারতে কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় ভারতীয় জনতা পার্টি আসার পর বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার, এমনকী হিন্দু সন্ন্যাসীকে জেলবন্দি করে রাখা এবং অবিরাম অনুপ্রবেশ বেড়েছে। তার জন্য দায় অনেকটাই অসম, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের মতো আঞ্চলিক দলগুলির অবিমৃশ্যকারিতা। কিন্তু এই নিয়ে যখন ভারতের মানুষ 'ভারতকে ধর্মশালা করে তোলা যাবে না' বলে স্লোগান তুলছে রাজ্যে রাজ্যে, তখন নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের নতুন প্রধানমন্ত্রীর কাছে হিন্দুদের বাঁচানো এবং মুসলমান অনুপ্রবেশ বন্ধ করা হবে সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ। যদি তিনি সফল হন, তাহলে ভারতের দিক থেকে সাহায্যের হাত অবশ্যই বাড়িয়ে দেওয়া হবে। আর না হলে, তার দায় নতুন প্রধানমন্ত্রীকেই নিতে হবে।

তবে তারেক রহমানের হাতে কোনো আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ নেই। সব প্রশাসকই একটা সিস্টেমের হাতের পুতুল। সেই বন্ধ্যাত্ব কাটিয়ে তারেক রহমানকে আরও একটি বড়ো চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে— তা হলো বিরোধী শক্তি জামাতের মোকাবিলা। জামাত এবার

বিএনপি-র জোটসঙ্গী ছিল না। সংসদে তাঁরা বিরোধী আসনেই বসবে। এবং বলেই দেওয়া যায়, তারা ফোঁস করতে একটুও পিছোবে না। এবং তারা তাদের অ্যাজেন্ডা— ভারত বিরোধিতা, হিন্দু বিরোধিতাকে ঢাল করেই এগোবে। তারেক কি পারবেন জামাতকে আগামীদিনে শক্তিহীন করে ফেলতে? বিষয়টা সহজ নয়, কারণ জামাত সম্পূর্ণভাবে পাকিস্তানি মদতপুষ্ট একটি অবিবেচক শক্তি। তারেক পারবেন, প্রতিবেশী এবং বাংলাদেশের পূর্বকর্তা পাকিস্তানকে বিরোধী হিসেবে মোকাবিলা করার শক্তি অর্জন করতে? বিশেষ করে যখন বাংলাদেশের অভ্যন্তরেই পাকিস্তানিরা (অর্থাৎ পাকিস্তানের সমর্থকরা) বহাল তবিয়তে বাস করছেন?

তারেক রহমান দেশের দায়িত্ব নিয়েছেন এমন একটা সময়ে যখন দেশটা ধ্বংস হয়ে গেছে। দেশের অর্থনীতি ধ্বংস, সমাজ ধ্বংস, সংস্কৃতি ধ্বংস। শিক্ষা লাটে উঠেছে। স্বাস্থ্যব্যবস্থা নেমেছে তলানিতে। মানুষের আবেগ, বিবেক, মূল্যবোধ, পারস্পরিক সম্মান প্রদর্শন নেই বললেই চলে। সেই অবস্থায় একটা ছোট্ট দেশকে ঘুরে দাঁড় করানোটা দুরূহ কাজ— ঈশ্বরেরও অসাধ্য। তাহলে তারেক গাঁটছড়া বাঁধবেন কার সঙ্গে?

এই মুহূর্তে পাকিস্তান নিজেই নিজের পায়ে কুড়ুল মারতে মারতে ধ্বংসের মুখোমুখি। চীন ও আমেরিকা সব সময়েই সাহায্য করবে কিন্তু নিজেদের স্বার্থত্যাগ করে নয়। মূলধন আর পাওনাগণ্ডা বুঝেসুঝেই আমেরিকা বা চীন বাংলাদেশকে সাহায্য করবে। সেটা যথেষ্ট ব্যয়বহুল একটা প্রচেষ্টা। তার ওপর দক্ষিণ-পূর্ব, এশিয়ার বৈশ্বিক রাজনীতিতে ভারত দ্রুত 'মহাগুরু' হয়ে ওঠার পথে এগোচ্ছে। তারেক এই পরিস্থিতিতে ভারতকে অস্বীকার করতে পারবেন না। কিন্তু গাঁটছড়া বাঁধতে গেলে তারেককে অনেক কিছু ত্যাগ করতে হবে। কী কী? যেমন মজহবি রাজনীতি, জনগণের একাংশের সমর্থন এবং জাতীয় পরম্পরা। আর না করলে— বাংলাদেশ কখনও ফিনিক্স পাখি হয়ে উঠবে না। থমকে দাঁড়ানো সরকারি প্রকল্পগুলিতে গতি আসবে না। অর্থনীতি চাঙ্গা হবে না। বেকারত্ব বাড়বে, কারণ অর্থের অভাবে শিল্প আসবে না। কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে না। মাথাপিছু আয় বাড়বে না। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা বাংলাদেশের মতো ছোটো রাজ্যে মানুষের প্রাণবায়ুর কাজ করে। সব ধ্বংস হয়ে গেছে। গড়তে হবে সবটাই শিল্পীর মতো করে। চ্যালেঞ্জটা বিশাল।

আরও একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ হলো আওয়ামি লিগের মোকাবিলা করা। হাসিনা নেই মানে আওয়ামি লিগ নেই— এমনটা এখনো হয়নি বাংলাদেশে। বিশাল সমর্থক বাহিনী রয়েছে আওয়ামি লিগের। তা প্রমাণ হয়েছে সামজিকভাবে ভোটদানের অঙ্কে। যদি আওয়ামি লিগ ভোট বয়কট না করত তাহলে আরও অন্তত কুড়ি শতাংশ বাড়ত ভোটদানের অঙ্কটা। কট্টর আওয়ামি লিগ সমর্থক নন, কিন্তু বিএনপি-কে ভোট দিয়েছেন বাধ্য হয়ে এমন ভোটারের সংখ্যাও এবারে কম হবে না, সেটা অনুমান করাই যায়। কারণ আওয়ামি লিগ শেখ হাসিনার দল হয়ে ওঠার অনেক আগে থেকেই ছিল মুজিবুর রহমানের পার্টি। তার মানে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো পার্টি। কারণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামি লিগই সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। তারেক রহমান না চাইলেও আগামীদিনে আওয়ামি লিগ আবার মাথাচাড়া দেবে। তারেক এই সত্যকে অস্বীকার করবেন না— এটা আশা করাই যায়। না করলে ধরে নিতে হবে— তিনি ভুল পথে পা বাড়াচ্ছেন। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে কি তিনি শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনবেন? সম্ভবত না। এমন তো নয়ই। কারণ শেখ হাসিনা শুধু বিতাড়িতই নয়, তাঁর মাথার ওপর ঝুলছে ফাঁসির আদেশ বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের। ফিরিয়ে আনতে হলে সেই আদেশের প্রেক্ষিতে মার্সি পিটিশন চেয়ে ফাঁসি নামঞ্জুর করতে হবে রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে। সবটাই বিশ বাঁও জলে হাতড়ানোর ব্যাপার। আর তাছাড়া তত কাঠ খড় পুড়িয়ে তিনি একজন বিরোধী নেত্রীকে আনবেনই-বা কেন? আনবেন— যদি তিনি চান— তাঁর বিরোধী পক্ষে জামাত নয়, তুলনামূলকভাবে গণতান্ত্রিক দল আসুক। কারণ তিনিও জানেন, জামাতের সঙ্গে লড়াই করে প্রধানমন্ত্রীর আসন ধরে রাখা যায়, দেশে শান্তি বজায় রাখা যায় না, আন্তর্জাতিক স্তরে দেশের সম্মান রক্ষাও হয় না।

ভারত কি তারেকের সঙ্গে হাত মেলাবে?

সমস্যাটা ভারতের নয়। একমাত্র প্রতিবেশী দেশ এবং সবচেয়ে বেশি লাগোয়া সীমান্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে যতখানি প্রয়োজন ঠিক ততখানিই চাইবে ভারতের বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার। কারণ ভারত জানে

সারণী

জয়পরাজয়ের খতিয়ান

বিএনপি—	২০৯	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি	১
জামাত—	৬৮	গণসংহতি আন্দোলন	১
এনসিপি—	৬	খেলাফত মজলিস	১
ইসলামিক—		স্বতন্ত্র প্রার্থী	৭
আন্দোলন বাংলাদেশ—১		বাংলাদেশ খেলাফত	
গণঅধিকার		—ই মজলিস	২
পরিষদ—	১		
আওয়ামি লিগ ভোটে অংশ নেয়নি			

তারেক রহমান চাইলেও ১০০ শতাংশ ভারতবন্ধু হতে পারবেন না। কারণ তাঁর পিছুটান অনেক। তাই সমস্যাটা তারেকের তথা বাংলাদেশের। একটি অবিমৃশ্যকারী জেহাদি অভ্যুত্থানের কাছে কিছু অকালপক্ক ও আনাড়ি রাজনৈতিক ভুঁইফোড় ভারত দখলেও স্বপ্ন দেখিয়েছিল বাংলাদেশের মানুষকে। নেহাত আনাড়ি ছাড়া আর কেউ সেই স্বপ্নে তা দেয়েনি। তারেকও জানেন, প্রতিবেশী গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে ভারত ছাড়া আর কাউকেই তিনি ষোলো আনা বিশ্বাস করতে পারবেন না। কিন্তু পিছুটান হলো তাঁর উপদেষ্টামণ্ডলী হিসেবে যাঁরা আসবেন তাঁরা। যদি তাঁরা নির্বোধ হন, ভারতের কিছু যায় আসবে না। আছাড় খাবে, হাত-পা গুঁড়িয়ে যাবে তাঁদেরই। একটি গাছের ডালে বসে সেই ডালটিই কাটতে গেলে যা হয়। তবে ভারত বুদ্ধিমান দেশ। বর্তমান সরকার, সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁকে ঘিরে থাকা জ্যোতিষ্কেরা কখনোই ভুল করেও বাংলাদেশের সঙ্গে পায়ে পা তুলে দিয়ে ঝগড়া করবে না, আবার লাই দিয়ে মাথায়ও তুলবে না। সম্পর্ক খারাপ করা হবে না, কারণ বাংলাদেশ পাকিস্তান নয়, কখনোও হবেও না। যদি হয়, তখন ভারত যা ব্যবস্থা নেবার নেবে। এখন ভারতের পক্ষে আশু কাজ হলো, ওপারে হিন্দুস্বার্থ রক্ষা করা, আর ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তকে গুরুত্ব দিয়ে সংরক্ষণ করা যাতে আর নতুন করে অনুপ্রবেশ না হয়। যাতে আর কোনোভাবেই জেহাদি সন্ত্রাস ভারতে সংঘটিত না হয়। আপাতত প্রয়োজন, কড়া নজর রাখা যাতে বিশ্বাসের জোরে যাঁতাকলে কোনো অশুভ শক্তি মাথা না গলিয়ে দেয়। □

বাংলাদেশ আপাতত রাহুমুক্ত
ঘাড় থেকে নেমেছে বেতাল

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি ।। বাংলাদেশে ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের পর নির্বাচিত সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। মনে হচ্ছে বাংলাদেশ গণতন্ত্রের পথে পা রেখেছে। শ্বাসরুদ্ধকর এক পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেয়েছে।

নির্বাচনের পর বাংলাদেশের নতুন গণতান্ত্রিক পথচলা শুরু হয়েছে, কিন্তু সত্যিকার গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে পথ চলবে কিনা তা সময়ই বলবে। তবু বলতে হয়, বহু কাঙ্ক্ষিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন হয়নি। দেশের এক বিরাট সংখ্যক মানুষ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি। নতুন গণতান্ত্রিক যাত্রায় এটা সবচাইতে নেতিবাচক দিক। দ্বিতীয়ত, এই নির্বাচনের মাধ্যমে জেহাদি জঙ্গি শক্তির বিরাট উত্থান ঘটেছে, যে শক্তি বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগী হিসেবে মানবতাবিরোধী ভূমিকায় অংশ নিয়েছিল। সেই জেহাদি শক্তি এখন প্রধান বিরোধী দল হিসেবে উঠে এসেছে। খুবই উদ্বেগের বিষয় যে, ভারত সীমান্ত লাগোয়া জেলাগুলোতে তাদের সাংগঠনিক তৎপরতা বিস্তৃত হয়েছে।

একাত্তর সালে পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক নারকীয় শাসন থেকে মুক্তির জন্য লড়াই হয়েছিল, প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষের রক্তে প্লাবিত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। এই মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তিসেনাদের রক্তস্রোতে মিশেছিল ভারতীয় সেনাদের রক্তও। সেই যুদ্ধে কয়েক লক্ষ নারী পাকিস্তানি খানসেনা ও তাদের দোসর রাজাকার-আলবদর বাহিনীর হাতে ধর্ষিত ও নির্যাতিত হয়েছিল, এক কোটিরও বেশি মানুষ, যাদের সিংহভাগ ছিল হিন্দু সমাজের মানুষ, আশ্রয় নিয়েছিল ভারতের মাটিতে। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল বাংলাদেশ। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ ধারণ করে প্রণীত হয় সংবিধান। বিশ্বের অন্যতম গণতান্ত্রিক সংবিধান বলে তা স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই সংবিধানের চেতনা কোনো শাসকই ধারণ করেননি। ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার স্বার্থে সংবিধানের গণতান্ত্রিক চেতনাকে কাটাছেঁড়া করেছেন বারবার, পুরোপুরি ইসলামি সংবিধানে পরিণত করতে দ্বিধা করেননি। বাংলাদেশের 'রাষ্ট্রধর্ম' হয়েছে ইসলাম। আর তার সঙ্গে আপস করেছে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়া আওয়ামি লিগও।

১৯৯০ সালে গণ-অভ্যুত্থান হয়েছে সামরিক স্বৈরাচার হটাতে, গণতন্ত্র ফেরেনি। স্বৈরাচার হটাতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল আওয়ামি লিগ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও সকল বামধারার দল। কিন্তু সেই ঐক্য টেকেনি। ১৯৯১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনে বিএনপি জয়ী হয়, আওয়ামি লিগ বিরোধী আসনে বসে। কিন্তু ১৯৯৬ সালে নির্বাচনে বিএনপি নিজেদের মতো করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে নির্বাচন করায় আওয়ামি লিগ, জামায়াতে ইসলাম-সহ কেউ অংশ নেয়নি। গণ-আন্দোলন শুরু হয়, নির্বাচনের এক মাসের মাথায় পতন ঘটে বিএনপি সরকারের। ফের নির্বাচনে আওয়ামি লিগ নির্বাচিত হয়। বিএনপি বিরোধী দলে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াত জোট ক্ষমতায় আসে। তাদের পাঁচ বছরের শাসনামলে সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দুদের ওপর হামলা ব্যাপক রূপ নিয়েছিল। ২০০৪ সালে আগস্টে বঙ্গবন্ধু এভেনিউতে আওয়ামি লিগ কার্যালয়ের সামনে বিরোধী নেত্রী শেখ হাসিনার জনসমাবেশে গ্রেনেড হামলায় ২৪ জনের প্রাণহানি হয়েছিল, আহত হয়েছিল পাঁচশোরও বেশি। হাসিনা অল্পের জন্যে

প্রাণে রক্ষা পান। এই শাসনকালে অসমের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি উলফার জন্যে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে অস্ত্র আনা হয়েছিল, যার সঙ্গে সরকারের সরাসরি যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠেছিল। এই অভিযোগের ভিত্তি ছিল, বিএনপি শাসনামলে উলফার শীর্ষ নেতৃত্বের অনেকেই বাংলাদেশে অবস্থান ভারতে নাশকতামূলক কাজকর্ম চালাতো।

বিএনপি-জামায়াত জোট ২০০৬ সালে নিজেদের মতো করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে নির্বাচন আয়োজনের চেষ্টা করলে আওয়ামি লিগের নেতৃত্বে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। আন্দোলন সহিংসতার রূপ নিলে ২০০৭ সালের গোড়ার দিকে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা গ্রহণ করে,তবে বেসামরিক ব্যক্তিদের নিয়ে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে। নেপথ্যে থাকেন সেনাপ্রধান মইন ইউ আহমেদ। শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়। খালেদার বড়ো পুত্র তারেক রহমানকে আটক করা হয়। অভিযোগ ছিল, তাঁকে প্রচণ্ড নির্যাতনের পর আর রাজনীতিতে ফিরবেন না, এমন মুচলেকা নিয়ে লন্ডন পাঠিয়ে দেওয়া হয়। খালেদার ছোটোপুত্র আরাফাত রহমান কোকো আটক না হলেও এক সময় মালয়েশিয়া চলে যান সপরিবারে। পরে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে নির্বাচন হয়, তার আগে অবশ্য শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেওয়া হয়। নির্বাচনে আওয়ামি লিগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়ী হয়। শেখ হাসিনা দ্বিতীয় বারের জন্য প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি অভিযোগ তুলে খালেদা বিরোধী নেত্রীর আসনে বসেন। কিন্তু সংসদ বর্জনকে বিএনপি প্রধান হাতিয়ার করে, যে অস্ত্রটি এর আগে শেখ হাসিনাও ব্যবহার করেছেন। উল্লেখযোগ্য হলো, শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া গ্রেপ্তার হওয়ার পর নোবেল শান্তি বিজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুস হঠাৎ রাজনীতির মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিলেন, একটি রাজনৈতিক দল গঠনের ঘোষণা করেছিলেন। একটি অফিসও স্থাপন করা হয় দলের জন্য। জানা গিয়েছিল, সেনাবাহিনী তাঁর এই প্রচেষ্টা সমর্থন না করায় তাঁকে শেষপর্যন্ত রাজনীতির মঞ্চ ত্যাগ করতে হয়।

২০০৮ সালে ক্ষমতায় আসার পর শেখ হাসিনা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন আয়োজনের ব্যবস্থা বাতিল করেন, দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর প্রতিবাদে সরব হয় বিএনপি, জামায়াত-সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। জাতীয় পার্টিকে (সেনাশাসক এরশাদ প্রতিষ্ঠিত) সঙ্গী হিসেবে পায় আওয়ামি লিগ। ২০১৪ সালের নির্বাচন ঘিরে প্রচণ্ড সহিংসতা ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। ১৫২টি আসনে আওয়ামি লিগ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে সেই নির্বাচন এবং পরবর্তীকালে ২০১৮ ও ২০২৪ সালের নির্বাচনে কার্যত বিরোধী দলগুলোকে দাঁড়াতেই দেওয়া হয়নি। এর মধ্যে নির্বাচন কমিশন জামায়াতে ইসলামির নিবন্ধন বাতিল করায় তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণই করতে পারেনি। অর্থাৎ হাসিনার শেষ তিন নির্বাচন অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়নি।

বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদকে হিন্দুদের অস্তিত্ব রক্ষায় এক ঐতিহাসিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। পরিষদ নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নেয়, সারাদেশে ভোটের আগে হিন্দুদের মুক্তিযুদ্ধের পতাকাতলে সংগঠিত করতে হবে। রুখতে হবে জামায়াত জোটকে, এছাড়া কোনো বিকল্প নেই। সবচেয়ে জোর দিতে হবে হিন্দুদের ভোটকেন্দ্রে আসার ওপর।

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে জেহাদি ছাত্র-জনতা আন্দোলন শুরু হয়েছিল সরকারি চাকরিতে কোটাকে কেন্দ্র করে। পরে এই আন্দোলন বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে পরিণত করে ছাত্রনেতারা, সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবি সামনে আসে। এই জেহাদি অভ্যুত্থানের মূল শক্তি ছিল জামায়াতে ইসলামি-সহ কট্টর ইসলামি দলগুলো। পাশে ছিল বিএনপি। লন্ডন থেকে সক্রিয় ছিলেন তারেক রহমান। বাইরে থেকে এই আন্দোলনে মূল মদত দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অতি সক্রিয় ভূমিকায় ছিল পাকিস্তান। সমর্থন ছিল তুরস্কের। বিপুল পরিমাণ অর্থের লেন-দেন হয়েছে, সর্বাধুনিক অস্ত্রের ব্যবহার হয়েছে শেখ হাসিনার সরকারকে হটাতে। ৫ আগস্ট তাঁকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়, সরকারের পতন ঘটে। শেখ হাসিনা ভারতে আশ্রয় নেন।

আন্দোলনের নেতাদের, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পছন্দের মুহাম্মদ ইউনুস প্যারিস থেকে উড়ে এসে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জামায়াত পছন্দের ব্যক্তিদের নিয়ে সাজানো হয় উপদেষ্টা পরিষদ। প্রভাব ছিল বিএনপিরও। ৫ আগস্ট থেকে বাংলাদেশ এক অন্ধকার যুগে প্রবেশ করে। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যা কিছু অর্জন সব ধ্বংস করা হয়। ধ্বংস করা হয় শেখ মুজিবের বাড়ি, যে বাড়ি থেকে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে স্বাধীনতা ঘোষিত হয়েছিল। এই বাড়িটির প্রতি পাকিস্তানিদের আক্রোশ ছিল, ধ্বংসের কাজটি করেছে ইউনুস বাহিনী। ধ্বংস করতে সরকারি প্রতিষ্ঠানের বুলডোজার ব্যবহার করা হয়। যেহেতু ইউনুসের নির্দেশে বাড়িটি ভাঙা হয়, সেকারণে সেনাবাহিনী,আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে, হামলাকারী জেহাদি ছাত্রদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেনি। প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, বিচার বিভাগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান, সংবাদমাধ্যম ব্যাংকিং সব জায়গায় হাত পড়ে ইউনুস বাহিনীর। সংবাদমাধ্যম ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান যেভাবে হামলা ও ধ্বংসের শিকার হয়েছে তা একমাত্র ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের হামলার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরম রূপ নেয়। সমালোচনা করলেই আওয়ামি লিগের সহযোগী আখ্যায়িত করে জেলে পাঠানো হয়। মব জাস্টিজের নামে সুপ্রিম কোর্ট-হাইকোর্টসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ছাত্র বাহিনী পাঠিয়ে ইউনুস চিহ্নিত ব্যক্তিদের সরিয়ে নিজের লোকদের বসিয়ে দেন। অভিযোগ, কোথায় কে বসবেন তার তালিকা ঠিক করে পাকিস্তানি দূতাবাস, জামায়াত ও ছাত্র নেতারা। দ্রুত পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা শুরু হয়, পাকিস্তানি মন্ত্রী ও সেনা কর্মকর্তাদের পদচারণা শুরু হয় বাংলাদেশের মাটিতে। চিকেন নেক দখল করে ভারতের সাত রাজ্য বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়, ইসলামি বাহিনী পাঠিয়ে দিল্লি দখলের স্বপ্ন দেখানো হয়। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ দুই দিক থেকে ভারতকে একই সঙ্গে হামলা করবে বলা হয়। এভাবে ভারতের সঙ্গে একটা

বৈরী সম্পর্ক তৈরি করা হয়। অন্যদিকে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দু সমাজ ও মুক্তিযুদ্ধের সমর্থকদের ওপর নারকীয় হামলা চালানো হয়, বাড়িঘর-দোকানপাট, মন্দির আক্রান্ত হয়, ইসলাম অবমাননার অভিযোগ তৈরি করে হিন্দুদের মারধোর করে, আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। মূল লক্ষ্য, হিন্দুরা যেন দেশ ছেড়ে চলে যায়। ১৯৭১ সালের পর এরকম নির্যাতনের শিকার আর হয়নি হিন্দুরা।

দুই।। এই নির্বাচন ইউনুসের বর্বর শাসনের অবসান ঘটিয়েছে, এটা বাংলাদেশের মানুষের কাছে সবচেয়ে বড়ো প্রাপ্তি। নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ এনেছে জামায়াতে ইসলামি ও আন্দোলনকারী ছাত্রদের দল জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। ভোটকেন্দ্রে কারচুপি, আগেই ভোটবাক্স ভর্তি করা, ছাপানো ব্যালট প্রার্থীদের হাতে ভোটের আগে তুলে দেওয়া ইত্যাদি অভিযোগ করা হয়েছে। প্রশাসনের কিছু লোকের কোনো দলের হয়ে কাজ করার অভিযোগও এসেছে। কিন্তু তার পরও মোটামুটি ভালো নির্বাচন হয়েছে। নির্বাচনের আগে কিংবা পরে বড়ো ধরনের হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেনি। ২০০৮ সালের নির্বাচন ছাড়া আর সব নির্বাচনেই ব্যাপক হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে, বিশেষ করে হিন্দু সমাজ জেহাদি আক্রমণের শিকার হয়েছে।

একটা বড়ো অভিযোগ উঠেছে ভোটের হার নিয়ে। ষাট শতাংশের কাছাকাছি ভোট পড়ার কথা বলা হলেও অনুসন্ধান বলছে, এটি অতিরঞ্জিত। আদতে ভোট পড়েছে অনেক কম। যেমন সকাল এগারোটার দিকে নির্বাচন কমিশনই জানায়, সারাদেশ থেকে প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী ১৪ শতাংশের মতো ভোট পড়েছে। এই সংখ্যা দুপুর দুটোর দিকে গিয়ে দাঁড়ায় ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশের মতো। বিকেল সাড়ে চারটায় ভোট বন্ধ হওয়ার পর দেখা গেল ষাটের কাছাকাছি। রাজধানী ঢাকায় বিশেষ করে পুরনো ঢাকায় বিভিন্ন কেন্দ্রে দেখা গেছে, খুব ভিড় কোথাও তেমন ছিল না। কোথাও একেবারে খালি দেখা গেছে। তাছাড়া 'হ্যাঁ' ভোট গণনার ক্ষেত্রে বড়ো ধরনের অসঙ্গতি লক্ষ্য করা গেছে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমেও এই অভিযোগ এসেছে।

নির্বাচন কমিশনের হিসেব অনুযায়ী এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটের হার ৫৯.৪৪ শতাংশ। অন্যদিকে গণভোটে 'হ্যাঁ' ভোটের পক্ষে ৬৮.০৫ শতাংশ ও 'না' ভোটের পক্ষে ৩১. ৯৫ শতাংশ ভোট পড়েছে। অর্থাৎ 'হ্যাঁ' জয়যুক্ত হয়েছে। তবে শুরুতেই জটিলতা তৈরি হয়েছে ১৭ ফেব্রুয়ারি শপথ গ্রহণের দিনই। বিএনপি'র নির্বাচিতরা সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নিলেও গণভোট অনুযায়ী সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে শপথ নেননি। বিএনপি জোটের নির্বাচিত মিত্র দলের সংসদ সদস্যরা এবং স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যরাও একই পথ অনুসরণ করেন। জামায়াত জোটের সদস্যরা দু'ভাবেই শপথ নেন। শপথ অনুষ্ঠানের শুরুতেই বিএনপি জানিয়ে দেয়, সংবিধানের তৃতীয় তফশিলে এ ধরনের শপথের উল্লেখ নেই। তারা সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে শপথ নেবেন না। কারণ সংবিধানে এর ভিত্তি নেই। বিএনপি'র এই অবস্থান রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। বলা হয়, ২০২৪ সালের তথাকথিত জুলাই আন্দোলনের সনদ ও গণভোটের মাধ্যমে সংবিধানের ৪৮টি সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়নের পক্ষে গণরায় এসেছে। সেই রায় কার্যকর করার জন্যেই সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠনের কথা। শপথ গ্রহণে এই বিভাজন অন্তর্বর্তী সরকারের এ উদ্যোগ রুখে দিল বলে ধারণা করা হচ্ছে।

কথাটা এভাবে স্পষ্ট করা দরকার, বিএনপি মুক্তিযুদ্ধের পর প্রণীত বর্তমান সংবিধান রক্ষায় বদ্ধপরিকর, তবে মনে করে কিছু সংস্কার করা যেতে পারে। এ কারণে জুলাই সনদ গ্রহণ করলেও অনেক জায়গায় আপত্তি রেখেছে। আর জুলাই আন্দোলনকারী ছাত্রদের দল এনসিপি ও তাদের মুরুব্বি জামায়াতে ইসলামি মুক্তিযুদ্ধের সংবিধান বাতিল করে নতুন সংবিধান চায়। বিএনপি মনে করে, এই সংবিধানের অধীনেই দেশের স্বার্থে গ্রহণযোগ্য ও প্রয়োজনীয় সংস্কার এগিয়ে নেওয়া যায়।

তিন।। এই নির্বাচন অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়নি আগেই বলা হয়েছে। শেখ হাসিনার তিন নির্বাচন (২০১৪ সালে দশম, ২০১৮ সালে একাদশ ও ২০২৪ সালে দ্বাদশ) অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়নি। তাই ইতিহাস গণতান্ত্রিক পরিমাপে অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের শ্রেণীবিন্যাসে দশম, একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনকে একই পঙ্‌ক্তিতে রাখবে। যদিও ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন এর মধ্যেই ব্যতিক্রম, জাতির ঘাড় থেকে 'বেতাল' নামিয়েছে, দেশ রাহুমুক্ত হয়েছে।

এবারের নির্বাচনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের বিশেষ করে হিন্দুদের। গত দেড় বছর ধরে হিন্দুদের ওপর যে নারকীয় নির্যাতন-নিপীড়ন হয়েছে এবং এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মুখোমুখি তাদের দাঁড় করিয়েছে, ঘুরে দাঁড়ানো ছাড়া তাদের বিকল্প ছিল না। এখানে বাংলাদেশ পুজা উদ্‌যাপন পরিষদের ভূমিকা উল্লেখ করতেই হয়। নির্বাচনে আওয়ামি লিগের অনুপস্থিতিতে দুই শক্তিধর শিবিরের মধ্যে এক শিবিরের (বিএনপি) ইসলামপ্রেম থাকলেও সামনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পতাকা, অন্য শিবির ইসলামি পতাকা হাতে পরিপূর্ণ ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা করে শরিয়া আইন চালু করার ক্ষণ গুনছিল। শেষোক্ত শিবিরের কোনো কোনো শরিক দল হিন্দুদের ওপর জিজিয়া কর চালুরও স্বপ্ন দেখছিল, হুঙ্কার দিচ্ছিল— 'আমরা সবাই তালেবান, বাংলা হবে আফগান'। এই শিবিরের নেতৃত্বদানকারী জামায়াতে ইসলাম ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে গণহত্যায় অংশ নিয়েছিল।

এই ক্রান্তিকালে বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদকে হিন্দুদের অস্তিত্ব রক্ষায় এক ঐতিহাসিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। পরিষদ নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নেয়, সারাদেশে ভোটের আগে হিন্দুদের মুক্তিযুদ্ধের পতাকাতলে সংগঠিত করতে হবে। রুখতে হবে জামায়াত জোটকে, এছাড়া কোনো বিকল্প নেই। সবচেয়ে জোর দিতে হবে হিন্দুদের ভোটকেন্দ্রে আসার ওপর। কারণ হিন্দুরা হতাশা ও শঙ্কায় ভেঙে পড়েছিল। তার ওপর আওয়ামি লিগ নেত্রী, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভোট বর্জনের ডাক দিয়েছেন ভারতের মাটি থেকে। গত পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে আওয়ামি লিগকেই প্রধানত ভোট দিয়েছেন হিন্দুরা।

তাই এই ডাক অনেকের মধ্যে দ্বিধার সৃষ্টি করেছিল। বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের নেতারা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে সারাদেশ ঘুরে এই আহ্বান জানান যে, 'কোনো দ্বিধা নয়, ভোটকেন্দ্রে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পতাকা যাদের সামনে তাদের ভোট দিতে হবে। আগে অস্তিত্ব বাঁচাতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাঁচলে দেশ বাঁচবে, হিন্দুরা বাঁচবে।'

বলা বাহুল্য, এই চেষ্টা সফল হয়েছে। বিএনপি ও তাদের মিত্ররা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। একটি হিসেব বলছে, তিনশো আসনের মধ্যে ৮০ থেকে ১০০ টি আসনে হিন্দুরাই ভোটের ফল নির্ধারণ করেছেন। অনেক আসনে বিএনপি জোটের প্রার্থীরা জয় পেয়েছেন ২ থেকে ৭ হাজার ভোটের ব্যবধানে। স্বাভাবিকভাবে এবারের ভোটে হিন্দুরা তাদের শক্তি প্রমাণ করতে পেরেছেন। এটাই ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সবচেয়ে বড়ো প্রাপ্তি। বিএনপি নেতারা এই সত্যটি স্বীকার করেছেন। □

অসমে প্রশ্নটা আর ‘কে জিতবে’ নয়, প্রশ্ন ‘বিজেপি কতটা এগিয়ে’

ধর্মানন্দ দেব

অসমের সমসাময়িক রাজনীতিতে আজ একটি মৌলিক ও গভীর পরিবর্তন স্পষ্ট। নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসুক, আলোচনার কেন্দ্রে আর সেই চিরাচরিত প্রশ্নটি নেই— ‘কে জিতবে?’ বরং প্রশ্নটি রূপ নিয়েছে আরও বাস্তব ও কঠোর এক অনুসন্ধানে— ‘ভারতীয় জনতা পার্টি কতটা ব্যবধানে এগিয়ে?’ এই পরিবর্তিত প্রশ্ন নিজেই অসমের বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতার সুদৃঢ় ইঙ্গিত বহন করে। কারণ, এটি কেবল বিজেপির শক্তির পরিচয় নয়; একই সঙ্গে বিরোধী রাজনীতির দীর্ঘস্থায়ী সীমাবদ্ধতা, বিভ্রান্তি এবং সাংগঠনিক দুর্বলতার প্রতিফলনও বটে।

গত এক দশকে অসমে বিজেপির উত্থান কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়। এটি পরিকল্পিত সংগঠন, ধারাবাহিক নেতৃত্ব এবং উন্নয়নকেন্দ্রিক রাজনীতির সম্মিলিত ফল। ২০১৬ সালের পর থেকে রাজ্যের রাজনৈতিক মানচিত্রে যে পরিবর্তন এসেছে, তা আজ আর অস্বীকার করার সুযোগ নেই। বিজেপি কেবল ক্ষমতায় আসেনি; তারা ক্ষমতায় থাকার একটি কার্যকর কাঠামো গড়ে তুলেছে; যেখানে সংগঠন, শাসন ও আদর্শ একে অপরকে শক্তিশালী করেছে। এই কাঠামোই আজ বিজেপিকে এমন এক অবস্থানে নিয়ে এসেছে, যেখানে লড়াইটা আর ক্ষমতা দখলের নয়, বরং ব্যবধান বাড়ানোর।

বহুদলীয় গণতন্ত্রে ক্ষমতার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সহজ নয়। সাধারণত দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকলে শাসকদলের বিরুদ্ধে স্বাভাবিকভাবেই প্রতিষ্ঠান-বিরোধী মনোভাব তৈরি হয়। কিন্তু বিজেপি এই প্রবণতাকে অস্বীকার না করে

কৌশলগতভাবে মোকাবিলা করেছে। কোথাও জনপ্রিয়তা কমলে প্রার্থী পরিবর্তন, কোথাও নতুন মুখ তুলে ধরা, আবার কোথাও সংগঠনের শৃঙ্খলা আরও জোরদার করা— এই সব পদক্ষেপের মাধ্যমে দল নিজেদের দুর্বলতাকে সংশোধন করেছে। একই সঙ্গে কল্যাণমূলক প্রকল্প ও উন্নয়নমূলক কাজের দৃশ্যমান ফলাফল তুলে ধরে তারা ভোটারদের সামনে একটি স্পষ্ট বার্তা রাখতে পেরেছে যে, অসম্পূর্ণ ও বিভক্ত বিকল্পের তুলনায় চলমান উন্নয়ন ও স্থিতিশীল শাসনই নিরাপদ।

২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি যখন অসমে প্রথমবারের মতো সরকার গঠন করে, তখন অনেকেই এটিকে সাময়িক রাজনৈতিক পরিবর্তন বলে ভেবেছিলেন। কিন্তু ২০২১ সালের নির্বাচনে ১২৬ আসনের বিধানসভায় বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোটের ৭৫টি আসন জয় সেই ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে। শুধু আসন সংখ্যা নয়, ভোটের শতাংশও ছিল তাৎপর্যপূর্ণ— বিজেপি এককভাবে প্রায় ৩৩ শতাংশের বেশি ভোট পায়, যেখানে প্রধান বিরোধী কংগ্রেসের ভোট শতাংশ ক্রমাগত কমতে থাকে। এই ফলাফল স্পষ্ট করে দেয় যে বিজেপির সাফল্য কোনও ক্ষণস্থায়ী রাজনৈতিক ঢেউ নয়, বরং একটি সুসংগঠিত ও গভীর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল এই প্রবণতাকে আরও জোরালো করে। ২০১৯ সালে অসমের ১৪টি লোকসভা আসনের মধ্যে বিজেপি ও তার মিত্ররা ৯টি আসন জেতে, আর ২০২৪ সালের নির্বাচনে এই সংখ্যা আরও দৃঢ়ভাবে বিজেপির পক্ষে থাকে। এই ধারাবাহিকতা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ লোকসভা ও বিধানসভা— দু’টি স্তরেই ভোটাররা মূলত একই রাজনৈতিক বার্তার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন, সেটা হলো স্থিতিশীলতা, শক্তিশালী নেতৃত্ব ও উন্নয়নের ধারাবাহিকতা। এই রাজনৈতিক সাফল্যের পেছনে বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি একটি মৌলিক ভূমিকা পালন করেছে।

বিজেপির এই বিশাল শক্তির আরেকটি উৎস হলো বিরোধীদের ধারাবাহিক ব্যর্থতা। গত কয়েক বছরে বিরোধী শিবির বহুবার ঐক্যের কথা বললেও বাস্তবে সেই ঐক্য কখনও স্থায়ী রূপ পায়নি। নেতৃত্বের প্রশ্ন, আসন বণ্টন নিয়ে মতবিরোধ, আদর্শগত বিভাজন এবং পারস্পরিক অবিশ্বাস বিরোধীদের এমন অবস্থায় নিয়ে গেছে, যেখানে তারা শাসকদলের বিরুদ্ধে একটি বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প হিসেবে নিজেদের তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। ২০২৩ সালে যে বিরোধী ঐক্যের প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছিল, ২০২৪ সালের নির্বাচনের সময়ে তা কার্যত ভেঙে পড়ে। একাধিক আসনে একাধিক বিরোধী প্রার্থী দাঁড় করানোয় ভোট বিভাজন অনিবার্য হয়ে ওঠে, আর এই বিভাজনের সরাসরি

রাজনৈতিক লাভ পায় বিজেপি।

ভোটারদের একটি বড়ো অংশ এই পরিস্থিতিকে রাজনৈতিক অস্থিরতার সম্ভাবনা হিসেবে দেখেছে। তাদের কাছে মনে হয়েছে, বিভক্ত বিরোধীর হাতে ক্ষমতা গেলে শাসন দুর্বল হবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে। এই স্থিতিশীলতা বনাম অনিশ্চয়তার দ্বন্দ্বে বিজেপি নিজেদের বারবার স্থিতিশীলতার প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। নির্বাচনী রাজনীতিতে এই মনস্তাত্ত্বিক সুবিধা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বহু ভোটার আদর্শগত বিতর্কের চেয়ে শাসনের ধারাবাহিকতাকেই বেশি গুরুত্ব দেন।

বিজেপির আরেকটি বড়ো শক্তি হলো তাদের অত্যন্ত কার্যকর ও শৃঙ্খলাবদ্ধ বুথ-স্তরের সাংগঠনিক কাঠামো। দলটি বহুদিন আগেই বুঝে নিয়েছে যে, নির্বাচন মূলত বুথেই জেতা বা হারা হয়। সেই উপলব্ধি থেকেই প্রতিটি ভোটকেন্দ্রকে একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক একক হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। বুথ সভাপতি থেকে শুরু করে পৃষ্ঠা প্রমুখ, শক্তিকেন্দ্র ও মণ্ডল স্তরের কর্মীরা ভোটার তালিকা যাচাই, নতুন ভোটারদের সঙ্গে যোগাযোগ, প্রবীণ ও অসুস্থ ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে পৌঁছাতে সহায়তা--- সব ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেন। এর ফলে ভোটের দিন বিজেপি কেবল সমর্থকদের শনাক্তই করতে পারে না, বরং নিশ্চিত করে যে তারা বাস্তবে ভোট দিতে যাবেন।

এই সাংগঠনিক উপস্থিতি শুধু নির্বাচনের সময়ে সীমাবদ্ধ নয়। সারা বছর ধরে তৃণমূল স্তরে বিজেপির কর্মীরা সামাজিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। পঞ্চায়েত ও স্থানীয় স্বশাসন স্তরে দলের সাফল্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখান থেকেই ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক তৈরি হয়। উন্নয়ন প্রকল্প, সরকারি সুযোগসুবিধা ও সামাজিক প্রকল্পের বাস্তব রূপ ভোটাররা প্রথমে এই স্তরেই দেখেন। ফলে লোকসভা বা বিধানসভা নির্বাচনের সময় বিজেপি একটি শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে প্রচারে নামতে পারে, যা বিরোধীদের ক্ষেত্রে প্রায় অনুপস্থিত।

নেতৃত্বের প্রশ্নে অসমের ক্ষেত্রে বিজেপির সবচেয়ে বড়ো রাজনৈতিক সম্পদ হলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তাঁর নেতৃত্বে রাজ্যে শাসনের একটি স্পষ্ট মডেল গড়ে উঠেছে— যার মূল বৈশিষ্ট্য দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, প্রশাসনিক সক্রিয়তা এবং দৃশ্যমান উন্নয়ন। তিনি কেবল একজন প্রশাসক নন; একজন দক্ষ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও। আইন-শৃঙ্খলা, অবৈধ অভিবাসন, পরিকাঠামো, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো সংবেদনশীল বিষয়ে তাঁর দৃঢ় অবস্থান বিজেপির 'কঠোর কিন্তু কার্যকর শাসন'-এর ভাবমূর্তি আরও মজবুত করেছে। ফলে বহু ভোটারের চোখে তাঁর কোনও বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প বিরোধীদের হাতে নেই।

উন্নয়নকে ভোটের ভাষায় রূপান্তর করার ক্ষেত্রেও বিজেপি বিরোধীদের থেকে অনেক এগিয়ে। রাস্তা, সেতু, মেডিক্যাল কলেজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের প্রকল্প--- এই সবকিছুকে তারা কেবল পরিসংখ্যান হিসেবে রাখেনি, বরং রাজনৈতিক বার্তায় পরিণত করেছে। জনধন যোজনা, আবাস যোজনা, বিনামূল্যের রেশন ও স্বাস্থ্য বিমার মতো প্রকল্প সমাজের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বিজেপির প্রতি এক ধরনের আস্থা ও নির্ভরতার সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। বিরোধীরা যখন এই প্রকল্পগুলির কোনও বাস্তব বিকল্প তুলে ধরতে পারেনি, তখন স্বাভাবিকভাবেই বিজেপির অবস্থান আরও শক্ত হয়েছে।

অসমের রাজনীতিতে পরিচয় ও 'ভূমিপুত্র' প্রশ্ন অত্যন্ত সংবেদনশীল। বিজেপি এই প্রশ্নে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট রেখেছে; স্থানীয় স্বার্থ রক্ষা, ভূমির পুনরুদ্ধার এবং একই সঙ্গে উন্নয়ন ও জাতীয় নিরাপত্তার ভাষায় সেই অবস্থানকে যুক্তিসঙ্গত করেছে। চা-শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ভূমি অধিকার প্রদান, শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্যোগ দীর্ঘদিনের ঐতিহাসিক বঞ্চনা সংশোধনের দৃষ্টান্ত। চা বাগান এলাকায় শতাধিক মডেল হাই স্কুল নির্মাণ ও শিক্ষার্থী ভর্তির উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি এক নীরব সামাজিক ও শিক্ষাগত রূপান্তরের ইঙ্গিত বহন করে।

এসসি, এসটি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষায়ও সরকারের অবস্থান দৃঢ়। সাতরা, বনাঞ্চল ও উপজাতি এলাকার দীর্ঘদিন দখল হয়ে থাকা জমি পুনরুদ্ধার কোনও বর্জনের রাজনীতি নয়; বরং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া। এই উদ্যোগ 'ভূমি পুত্রদের' আত্মসম্মান, নিরাপত্তা ও পরিচয়ের প্রশ্নকে নতুন করে রাজনৈতিক গুরুত্ব দিয়েছে এবং বহু মানুষের মধ্যে সরকারের প্রতি আস্থা বাড়িয়েছে।

এই সমগ্র রাজ্যভিত্তিক বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্যের সমন্বিত শাসনের সুবিধা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে 'কংগ্রেস-মুক্ত ভারত'-এর রাজনৈতিক আহ্বান কেবল একটি স্লোগানে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং তা একটি দীর্ঘমেয়াদি সাংগঠনিক ও আদর্শগত দিশায় রূপ নিয়েছে। 'মেক ইন ইন্ডিয়া', 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' ও 'আত্মনির্ভর ভারতের' মতো কর্মসূচির মাধ্যমে উন্নয়ন ও প্রশাসনিক সংস্কারকে রাজনীতির কেন্দ্রে আনা হয়েছে। এই জাতীয় রাজনৈতিক স্রোতের প্রভাব অসমেও গভীরভাবে পড়েছে এবং ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন থেকে শুরু করে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত তার ধারাবাহিক প্রতিফলন দেখা গেছে।

সব মিলিয়ে বলা যায়, অসমের বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় প্রশ্নটা আর 'কে জিতবে' নয়। প্রশ্নটা সত্যিই 'বিজেপি কতটা এগিয়ে'। কারণ বিজেপি আজ কেবল বিরোধীদের দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছে না; তারা নিজেদের শক্তিশালী সংগঠন, কার্যকর নেতৃত্ব, উন্নয়ননির্ভর শাসন ও সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক কৌশলের মাধ্যমে একটি দীর্ঘমেয়াদি শাসনের ভিত গড়ে তুলেছে। যতদিন বিরোধীরা একটি ঐক্যবদ্ধ, বিশ্বাসযোগ্য ও বাস্তব বিকল্প হিসেবে নিজেদের তুলে ধরতে পারবে না, ততদিন অসমের রাজনীতিতে এই ব্যবধান কমার কোনও বাস্তব ইঙ্গিত দেখা যাবে না।

(লেখক পেশায় আইনজীবী)

কাঁচাপয়সা বনাম ব্যাংক আমানত

যদি কোন বালককে বিগড়ে দিতে হয় তাহলে তার হাতে ছোটো বেলা থেকেই কাঁচাপয়সা গুঁজে দাও। ব্যাস, আর দেখতে হবে না। গড়গড়িয়ে জাহান্নামের দিকে সে এগিয়ে যাবে। কোনো ভালো কাজ আর করবে না। শুনবে না কোনো ভালো পরামর্শ। খোঁজ নিয়ে দেখবেন বহু যৌথ পরিবারের ভালো ভালো ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে এই পদ্ধতিতে কূটকৌশলে কুচক্রী আত্মীয়রা যুগে যুগে এই কাজ করে এসেছে। এই পথেই তারা খুলে দিয়েছে নরকের দ্বার।

অন্যদিকে ব্যাংক আমানত সৃষ্টি হয় সাময়িক আনন্দের দিকে না তাকিয়ে একটু কৃচ্ছসাধন করে। আজকের সাময়িক আনন্দ থেকে বিরাম, আগামীদিনে তিলে তিলে সৃষ্টি করা ব্যাংক আমানত দিয়ে গঠনমূলক বহু কাজ করা যায়। ব্যক্তি, সমাজ ও দেশের প্রভুত উন্নতি সম্ভব। জাতির ও জাতীয় উন্নতি সম্ভব।

কাঁচাপয়সা ও ব্যাংক আমানত দুই বিপরীত ধর্মী উপাদান। কাঁচা পয়সা উৎপাদন ও উন্নয়নের পক্ষে বিরাট বাধা। বলে রাখা ভালো, কাঁচাপয়সা স্বল্পমেয়াদে কিছুটা সহায়ক হলেও দীর্ঘমেয়াদি বিপদ। কাঁচাপয়সা হাতে পেলে বিচারবুদ্ধি নষ্ট হয়। আর সেই সুযোগটাই স্বার্থপর মানুষ নিজের কাজে লাগায়। আজ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য বাজেটে আছে শুধু ভাতার নামে কাঁচাপয়সা বিলোনোর ব্যবস্থা। নেই কোনো উন্নয়নের সদিচ্ছা। নেই কোনো কর্মসংস্থানের রূপরেখা। বাঙ্গালিকে কুঁড়ে ও হাত পাতা হাভাতে পরিণত করার ব্লুপ্রিন্ট হলো আমাদের এই রাজ্যের বাজেট। বাঙ্গালিকে কর্মচঞ্চল ও উদ্যোগপতি বানাতে হলে ভাতাভিত্তিক বাজেটের বিরুদ্ধে সবাইকে রুখে দাঁড়াতে হবে। এই লড়াই পশ্চিমবঙ্গে ভূমিপুত্র বাঙ্গালির উত্থানের লড়াই। ইংরেজি ভাষা ও ইংরেজ (ব্রিটিশ) যেমন এক নয়। ঠিক তেমনি বাংলা ভাষা আর বাংলাদেশি ও পশ্চিমবঙ্গবাসী এক নয়। ভাতার মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশিকে বাঙ্গালি অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গবাসী বানানোর এক ঘৃণ্য চক্রান্ত শুরু হয়েছে। এতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সঙ্গে দেশের সমান বিপদ। তাই একটু খোলা মনে ভাবার অনুরোধ রইল।

—শ্যামল কুমার হাতি,
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

চালুনি বলে—ছুঁচ, তোর পিছে কেন ছ্যাঁদা!

'বঙ্কিমদা'-র পর স্বামী শ্রীরামকৃষ্ণ। এসব কি ইচ্ছাকৃত? এঁদের তো স্ক্রিপ্ট লিখে দেওয়ার জন্য বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা থাকেন। সেক্ষেত্রে এরকম ভুল তো হওয়ার কথা নয়!

যদিও গুজরাটিরা দাদাকে 'ভাই' বলেন। বড়দাদা মানে 'মোটা ভাই'। মূলত সম্মান জানানোর জন্যেই 'ভাই' শব্দটি ব্যবহার করেন। যেমন বল্লভভাই প্যাটেল, নরেন্দ্রভাই দামোদর দাস মোদী ইত্যাদি। সেক্ষেত্রে 'ভাই'-এর বঙ্গানুবাদ করলে সেটা অসম্মানজনক হয় না। আর 'বাবু' শব্দটিতে মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের নিজেরই আপত্তি ছিল। তাঁর লেখা 'বাবু' কাহিনি পড়লে তো সেরকমই মনে হয়। তাই বঙ্কিমবাবু বললেও তাঁর ক্ষেত্রে অসম্মানজনক হয়।

'স্বামী' শব্দের ব্যবহারের ব্যাখ্যা হিসেবে বলা যায়, সন্ন্যাসীদের নামের আগে 'স্বামী' শব্দের ব্যবহার একটি সনাতনী পরম্পরা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও প্রথাগত সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সন্ন্যাসগুরুর নাম তোতাপুরী। তাছাড়া দেশের কাজে একজন উৎসর্গীকৃত স্বয়ংসেবক বন্দে মাতরমের স্রষ্টার নামকে বিকৃত করবেন বা শ্রীরামকৃষ্ণের নাম জানেন না বা তাঁকে স্ক্রিপ্ট-রাইটারের কাছ থেকে জানতে হবে— এমনটা হতে পারে না। কিন্তু এর ফলে জনমানসে যে বিরূপ ধারণা তৈরি হচ্ছে, তা তো অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে থেকে যাবে। সর্বোপরি মানুষ হাপিত্যেশ করে অপেক্ষায় আছেন পরিবর্তনের জন্য। সেই আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের পথে বাধা আসাটা ঠিক নয়। তাই এখন সতর্ক ভাবে বুঝেশুনে কথা বলাই সমীচীন।

তবে যে বা যাঁরা এর প্রবল সমালোচনা করছেন তাঁদের নেত্রী একটি সভায় মতুয়া সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু গুরুচাঁদ ঠাকুরের নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে 'গরুচাঁদ' বলে ফেলেছিলেন। তাছাড়া সিধু-কানু স্মরণ অনুষ্ঠানে ডহরবাবুর বাড়ির লোক কে আছেন বলে তলব করার মতো হাস্যকর ঘটনা তো আছে। এরকম দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে। 'চালুনি বলে— ছুঁচ, তোর পিছে কেন ছ্যাঁদা'।

—অজয় ভট্টাচার্য,
বনগ্রাম উ: ২৪ পরগনা।

দোলযাত্রা

স্বস্তিকা পত্রিকায় ২ মার্চ ২০২৬, সংখ্যায় 'দোলযাত্রা : নানান দেশে নানান রূপে' তথ্যসমৃদ্ধ লেখাটির জন্য লেখক শুভদীপ পাল মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই। দোল বা হোলি নিয়ে কিছু বিভেদকামী ব্যক্তি বাঙ্গালি-অবাঙ্গালি ভেদ রচনা করেন, তখন শুভদীপবাবুর লেখাটি তার একটি উপযুক্ত জবাব। তিনি শুধু ভারতের রাজ্যে রাজ্যে নয়, বিশ্বের কয়েকটি দেশেরও দোলযাত্রায় বর্ণনা দিয়েছেন। এরকম তথ্যসমৃদ্ধ লেখার জন্য স্বস্তিকা পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীকেও ধন্যবাদ জানাই। আর একটি বিষয় হলো, এই সংখ্যার গল্পগুলি পাঠকদের কিংবা সমাজকে কোনো বার্তা দেওয়ার মতো নয়। স্বস্তিকার পাতায় এমন নিম্নস্তরের গল্প প্রকাশ না করলেই ভালো হতো। গল্প নির্বাচনে সম্পাদকীয় বিভাগের খুব সচেতন থাকা প্রয়োজন বলে মনে করি।

—শেখর মুখোপাধ্যায়,
বাঁশদ্রোণী, কলকাতা-৭০।

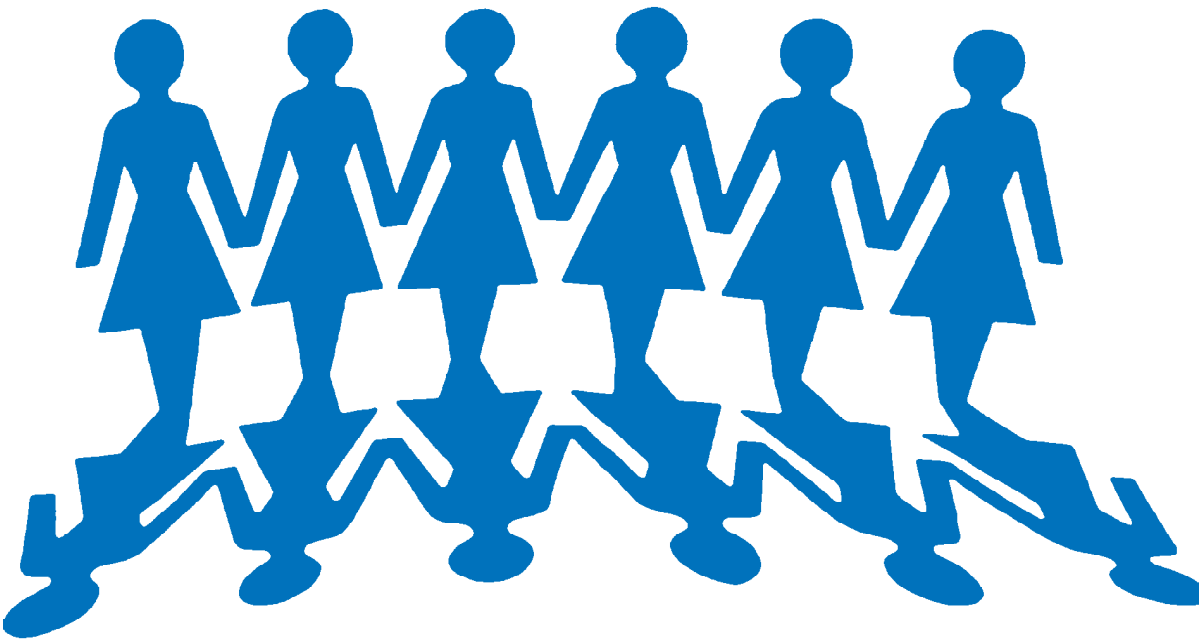

কন্যার স্বপ্ন, দেশের শক্তি

শিক্ষা ও সুরক্ষায় কেন্দ্রের সমন্বিত লড়াই

অরুণা রায়চৌধুরী

ভারতের সামাজিক ইতিহাসে নারীশিক্ষা ও কন্যাশিশুর সুরক্ষা একটি দীর্ঘ সংগ্রামের বিষয়। একদিকে অন্ধবিশ্বাস, দারিদ্র্য ও লিঙ্গবৈষম্য; অন্যদিকে আধুনিক শিক্ষা, আইনি সুরক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়নের স্বপ্ন এই দ্বৈত বাস্তবতার মাঝেই কেন্দ্রীয় সরকার গত এক দশকে একাধিক সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। নাবালিকা বিবাহ রোধ, মেয়েদের স্কুলে ধরে রাখা এবং তাদের আর্থিক-সামাজিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলাই এই প্রকল্পগুলির মূল লক্ষ্য। ২০১৫ সালে শুরু হওয়া 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' প্রকল্পটি কেবল একটি সরকারি স্কিম নয়, বরং একটি সামাজিক আন্দোলন। এর উদ্দেশ্য হলো কন্যাশিশুর জন্মহার বৃদ্ধি, লিঙ্গ অনুপাতের ভারসাম্য রক্ষা এবং মেয়েদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ বাড়ানো। এই প্রকল্পের মাধ্যমে জেলা ও ব্লক স্তরে সচেতনতা শিবির, প্রচারাভিযান, স্কুল-কলেজে কর্মশালা, ধর্মীয় ও সামাজিক নেতাদের সম্পৃক্ত করা, সবই করা হয়েছে। মেয়েকে বাঁচাও, পড়াও— এই বার্তা পরিবারে পরিবারে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। যখন সমাজ বুঝতে শুরু করে যে কন্যাসন্তানও পরিবারের সম্পদ, তখন নাবালিকা বিবাহের প্রবণতা স্বাভাবিকভাবেই কমে এসেছে।

অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা অনেক সময় পরিবারকে অল্প বয়সে মেয়ের বিয়ে দিতে প্ররোচিত করে। এই মানসিকতা বদলাতে চালু সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা। এই প্রকল্পে ১০ বছর বয়সের নীচে মেয়ের নামে সঞ্চয় অ্যাকাউন্ট খোলা যায়। সরকার উচ্চ হারে ঋণ দেয় এবং আয়কর ছাড়ের সুবিধাও থাকে। মেয়ের ১৮ বছর পূর্ণ হলে উচ্চশিক্ষার জন্য এবং ২১ বছরে বিয়ের উপযুক্ত বয়সে সেই অর্থ ব্যবহার করা যায়। ফলে পরিবার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় উৎসাহিত হয় এবং অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়ার প্রবণতা কমে।

অনেক মেয়েই অষ্টম শ্রেণীর পর পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। এই সমস্যা সমাধানে চালু হয় National Scheme of Incentives to Girls for Secondary Education (NSIGSE)। এই প্রকল্পে নির্দিষ্ট শ্রেণীর মেয়েদের নামে অর্থ জমা রাখা হয়, যা তারা ১৮ বছর বয়সে পায়। শর্ত থাকে যে তারা মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করবে এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় বিয়ে করবে না।

এটি কেবল আর্থিক প্রণোদনা নয়, বরং শিক্ষায় স্থায়িত্বের একটি শক্তিশালী বার্তা।

১১ থেকে ১৮ বছর বয়সি মেয়েদের পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও জীবনদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য চালু হয়েছিল Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls, যা জনপ্রিয়ভাবে 'সবলা' নামে পরিচিত। এই প্রকল্পের আওতায় কিশোরীদের পুষ্টিকর খাদ্য, স্বাস্থ্য সচেতনতা, প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। অনেক স্কুলছুট কিশোরীকেও পুনরায় শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করা হয়। নাবালিকা বিবাহের ঝুঁকি কমাতে স্বাস্থ্য ও আত্মবিশ্বাস দুটোই গুরুত্বপূর্ণ, 'সবলা' সেই দিকটি শক্তিশালী করে।

এছাড়াও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়াতে চালু হয় CBSE Udaan। এই প্রকল্পের মাধ্যমে মেধাবী ছাত্রীদের অনলাইন স্টাডি মেটেরিয়াল, ভার্চুয়াল ক্লাস ও মেন্টরিং দেওয়া হয়, যাতে তারা ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তিগত শিক্ষায় এগিয়ে যেতে পারে। যখন একটি মেয়ে দেখে যে তার ভবিষ্যৎ কেবল বিয়েতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সে বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী বা প্রশাসক হতে পারে, তখন সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিও বদলাতে শুরু করে। শুধু প্রণোদনা নয়, আইনি সুরক্ষাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। Child Marriage Prohibition Act 2006 অনুযায়ী ১৮ বছরের নীচে মেয়ের এবং ২১ বছরের নীচে ছেলের বিয়ে আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। এই আইনের মাধ্যমে জেলা প্রশাসন, পুলিশ ও চাইল্ড প্রোটেকশন ইউনিটগুলিকে সক্রিয় করা হয়েছে। বহু ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন সময়মতো হস্তক্ষেপ করে নাবালিকা বিবাহ বন্ধ করেছে। আইনের কঠোর প্রয়োগ সামাজিক বার্তা দেয় যে শিশু বিবাহ আর সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

'সমগ্র শিক্ষা' প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত একীভূত শিক্ষা উন্নয়ন করা হচ্ছে। পরিকাঠামো উন্নয়ন, পৃথক শৌচালয়, স্যানিটারি হাইজিন, নিরাপদ পরিবেশ— এসব মেয়েদের স্কুলে ধরে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মেয়েদের জন্য আলাদা টয়লেট ও নিরাপদ ক্যাম্পাসের ব্যবস্থা থাকলে তাদের স্কুলছুট হওয়ার হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়।

এছাড়াও মেয়েদের শিক্ষায় ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সমান গুরুত্বপূর্ণ। কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ুষ্মান ভারত কর্মসূচির আওতায় দরিদ্র পরিবারের মেয়েরা বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা পাচ্ছে, ফলে অসুস্থতার কারণে পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কমেছে। স্কুল পর্যায়ে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি সচেতনতা, স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ এবং কিশোরী স্বাস্থ্য কর্মসূচি মেয়েদের আত্মবিশ্বাস বাড়াচ্ছে। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার যুগে প্রযুক্তিগত অন্তর্ভুক্তিও এক বড়ো ভূমিকা পালন করছে। অনলাইন শিক্ষা প্ল্যাটফর্ম, ডিজিটাল ক্লাসরুম এবং স্কলারশিপ পোর্টালগুলির মাধ্যমে মেয়েরা ঘরে বসেই শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। কোভিড-পরবর্তী সময়ে এই ডিজিটাল পরিকাঠামো বহু ছাত্রীকে শিক্ষার ধারায় ফিরিয়ে এনেছে।

শিক্ষা শুধু বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; তা কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত হলে তবেই প্রকৃত ক্ষমতায়ন ঘটে। বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি যেমন কারিগরি প্রশিক্ষণ, স্টার্ট-আপ সহায়তা এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, মেয়েদের আর্থিক স্বাধীনতার পথ খুলে দিচ্ছে। একটি আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী কন্যা পরিবারের কাছে আর বোঝা নয়, বরং সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি সফল করতে রাজ্য সরকার, জেলা প্রশাসন, বিদ্যালয়, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং পঞ্চায়েত স্তরের সমন্বয় অত্যন্ত জরুরি। অনেক জায়গায় 'চাইল্ড ম্যারেজ ফ্রি' গ্রাম ঘোষণা করা হয়েছে, যেখানে স্থানীয় কমিটি নজরদারি রাখছে। শিক্ষক, আশাকর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা সম্ভাব্য ঝুঁকির খবর প্রশাসনকে জানাচ্ছেন। এই তৃণমূল পর্যায়ের সক্রিয়তা প্রকল্পগুলির কার্যকারিতা বাড়িয়েছে।

সবচেয়ে বড়ো পরিবর্তন এসেছে সামাজিক মানসিকতায়। আজ অনেক পরিবারই মেয়ের উচ্চশিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। কন্যাসন্তানের জন্মদিন উদ্‌যাপন করা হচ্ছে, তাদের স্বপ্নকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। মিডিয়া, সামাজিক প্রচার এবং সফল নারী আদর্শদের গল্প সমাজকে নতুন দিশা দেখাচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায়, কেন্দ্রীয় সরকারের এই বহুমুখী উদ্যোগগুলি একে অপরের পরিপূরক। একদিকে সচেতনতা, অন্যদিকে আর্থিক সুরক্ষা; একদিকে আইনি কঠোরতা, অন্যদিকে শিক্ষায় প্রণোদনা— সব মিলিয়ে একটি সামগ্রিক কাঠামো তৈরি হয়েছে। নাবালিকা বিবাহের বিরুদ্ধে লড়াই কেবল আইন দিয়ে সম্ভব নয়; আবার শুধু অর্থ দিয়ে সচেতনতা আসে না। তাই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি ও সামাজিক মানসিকতার পরিবর্তন— এই চারটি স্তম্ভকে কেন্দ্র করে প্রকল্পগুলি গড়ে উঠেছে।

মেয়েরা যখন স্কুলে থাকে, তখন তারা শুধু পড়াশোনা করে না, তারা স্বপ্ন দেখে। তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার শক্তি অর্জন করে। একটি শিক্ষিত কন্যাসন্তান মানে একটি শক্তিশালী পরিবার, একটি উন্নত সমাজ এবং একটি প্রগতিশীল জাতি।

'কন্যার স্বপ্ন' আসলে 'দেশের শক্তি', আর সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে কেন্দ্রীয় সরকারের এই সমন্বিত লড়াই আগামী ভারতের ভিত্তি নির্মাণ করছে। ▫

খাদ্যের বিষক্রিয়া থেকে বাঁচার ঘরোয়া উপায়

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

চারদিকে অখাদ্য-কুখাদ্যের ছড়াছড়ি দেখে আমরা অনেকেই আতঙ্কিত, কখন কী ঘটে যায় তা নিয়ে। তবে এছাড়াও নানা কারণে খাবার থেকে বিষক্রিয়া হতে পারে। জেনে নিন এর থেকে মুক্তির ঘরোয়া উপায়।

রসুন : ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকরোধী উপাদান রয়েছে এতে। ফলে ডায়রিয়া ও ডায়রিয়াজনিত পেটব্যথা থেকে আরাম দেয়। এক কোয়া সতেজ রসুন লজেন্সের মতো চুষে খেতে পারেন। পরে এক গ্লাস হালকা গরম জল খেয়ে নিন। এছাড়াও রসুনসেদ্ধ জল সারাদিন ধরে অল্প করে চুমুক দিয়ে খেলেও উপকার পাওয়া যায়।

লেবু জল : পেটে ব্যাকটেরিয়াজনিত সমস্যা সমাধানে অত্যন্ত কার্যকর লেবুর জল। এক টেবিল-চামচ লেবুর রসে এক চিমটি লবণ মিশিয়ে প্রতিদিন ২-৩ বার পান করুন। এতে হজম ভালো হবে। এক গ্লাস হালকা জলে পুরো একটি লেবুর রস মিশিয়ে তা সারাদিন ধরে পান করতে পারেন।

আপেল সিডার ভিনিগার : এতে থাকা অম্লীয়, উপাদান বদহজমের সমস্যা তাড়াতাড়ি কমায়। এক গ্লাস হালকা গরম জলে ২ টেবিল-চামচ অ্যাপল সিডার ভিনিগার মিশিয়ে খেতে হবে।

পুদিনা : পেটের গড়বড় থেকে মুক্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুনাম রয়েছে এই ভেষজের। এর অ্যান্টিমাইক্রোবায়াল উপাদান পেটের যাবতীয় ব্যাকটেরিয়া ও মাইক্রো-অর্গানিজম দূর করতে সাহায্য করে।

২-৩ কাপ জল ও কয়েকটি পুদিনা পাতা একত্রে ফুটিয়ে নিতে হবে। ঠাণ্ডা করার পর তাতে যোগ করতে হবে অল্প পরিমাণে মধু। তারপর সারাদিন ধরে তা খেতে হবে। এছাড়াও একটু স্বাদ বাড়াতে চাইলে এক বাটি দইয়ের মধ্যে কয়েকটি এই পাতা যোগ করতে পারেন।

কমলার রস : খনিজ, ভিটামিন ও পুষ্টিগুণে ভরপুর ফল কমলা। যা শরীরের রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখতে উপকারী। ব্লেন্ডারে ৬ থেকে ৭টি মাঝারি আকারের কমলা ও দুই টেবিল-চামচ কর্নস্টার্চ সিরাপ মিশিয়ে শরবত তৈরি করে দিনে কয়েকবার খেতে হবে।

এছাড়া পেট ভালো রাখতে কয়েক ঘণ্টা ভারী ও দুগ্ধজাত খাবার, কফি, মদ্যপান ও ধুমপান থেকে বিরত থাকতে হবে। আর প্রচুর পরিমাণে জল পান করতে হবে।

জিরে : খাদ্যের বিষক্রিয়াজনিত অস্বস্তি ও জ্বালাপোড়া কমাতে জিরে আদর্শ। সারাদিন ধরে জিরে চিবিয়ে খেতে পারেন। কিংবা এক কাপ জলে এক টেবিল-চামচ জিরে ফুটিয়ে নিয়ে তাও খেতে পারেন। এর সঙ্গে আরও যোগ করতে পারেন এক টেবিল-চামচ ধনেপাতার রস ও সামান্য লবণ। পানীয়টি পান করতে হবে দিনে দু'বার।

মধু : ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকরোধী মধু হজমের সমস্যা ও খাদ্যে বিষক্রিয়া দূর করতে অত্যন্ত উপকারী। পেটে অতিরিক্ত অ্যাসিড জমা থেকে বাঁচতে দিনে ৩ বার এক চামচ করে মধু খেতে পারেন। এতে পেটের গোলমাল দূর হবে।

কলা : ডায়রিয়া ও বমি হলে শরীর থেকে প্রচুর পটাশিয়াম বেরিয়ে যায়। তবে একটি পাকাকলা পটাশিয়ামের স্বাভাবিক মাত্রা ফিরিয়ে আনতে যথেষ্ট। ২টি কলা আর ১ কাপ দুধ এক সঙ্গে ফুটিয়ে তার মধ্যে এক চিমটি দারুচিনির গুঁড়ো ছিটিয়ে দিলেও ক্ষতি নেই। পান করতে হবে দিনে ৩ বার।

মেথি : পেটের সমস্যা তাড়াতে মেথির গুণও অনন্য। এক টেবিল-চামচ মেথি নরম হওয়া পর্যন্ত জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। এই মেথি খাওয়ার পর খেতে হবে এক টেবিল-চামচ দই। কিছুক্ষণ পরপর এভাবে খেতে হবে। দইয়ের মাইক্রোবায়াল ও ব্যাকটেরিয়ারোধী উপাদান খাদ্যে বিষক্রিয়ার জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়া দূর করে। □

বাংলাদেশে সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর মুক্তির বিষয়ে বর্তমান সরকার আইনের নিরপেক্ষতা প্রমাণ করতে না পারলে বিশ্ববাসীর কাছে একটি বিশেষ বার্তা যাবে। আর সেটির কারণে বর্তমান সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে কঠিন প্রশ্ন উঠাই স্বাভাবিক।

চিন্ময়কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর মুক্তির ইস্যুতে বাংলাদেশে বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ

সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী

বাংলাদেশে বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতা নিয়ে বিতর্ক নতুন নয়। তবে সাম্প্রতিক সময়ে চিন্ময়কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীকে কেন্দ্র করে যে ঘটনাপ্রবাহ তৈরি হয়েছে, তা এই প্রশ্নকে আবারও নতুন করে আমাদের সামনে নিয়ে এসেছে। এই মামলায় অভিযোগের প্রকৃতি, প্রমাণের মানদণ্ড, তদন্তের স্বচ্ছতা ও বিচারপ্রক্রিয়ার গতি— এসব বিষয় এখন কেবল একটি ব্যক্তিকে ঘিরে আইনি লড়াইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; বরং তা দেশের আইনি কাঠামো, সংবিধানিক আদর্শ, সংখ্যালঘু অধিকার, নিরপেক্ষতা এবং আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সম্পর্কের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে পড়েছে।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার পরিসরে বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। বাংলাদেশে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে গ্রেপ্তার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশে বাধা দেওয়ার অভিযোগ নিয়ে অ্যামনিস্টি ইন্টারন্যাশনাল একাধিকবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এ বিষয়ে তাদের অবস্থান স্পষ্ট— আইনের শাসন কেবল আইন প্রয়োগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা ও ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তার ওপর নির্ভরশীল। কোনো ধর্মীয় নেতা বা রাজনৈতিক কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে তা স্বাধীন তদন্ত ও নিরপেক্ষ বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিষ্পত্তি হওয়া উচিত; অন্যথায় তা মানবাধিকার লঙ্ঘনের আশঙ্কা তৈরি করে। সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট কোনো অভিযোগ নেই। তাঁর একটাই অপরাধ তিনি সনাতনী, হিন্দু। মোল্লাবাদীদের সন্তুষ্ট করতে গিয়েই ইউনূস সরকার তাঁকে বিনা বিচারে কারাবাস দিয়েছে। তার এই কারাবাস পাকিস্তানিদের খুশি করে রেখেছে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার হাইকমিশনার ভলকার তুর্ক

একইভাবে ইউনাইটেড নেশনস্ হিউম্যান রাইটস্ অফিস বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় আইনের শাসন ও সংখ্যালঘু নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলেছে বারবার। জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার হাইকমিশনার ভলকার তুর্ক বিচারব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার ওপর জোর দিয়েছেন। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কাঠামো অনুসারে, সরকারি পদক্ষেপ যদি ধর্মীয় পরিচয় বা রাজনৈতিক অবস্থানের ভিত্তিতে কঠোর বা বাছাইকৃত বলে প্রতীয়মান হয়, তবে তা বৈষম্যের অভিযোগকে উসকে দিতে পারে। এই মামলায় সেটির ব্যতিক্রম নয়। আঞ্চলিক

ও বৈশ্বিক কূটনৈতিক প্রতিক্রিয়া বিষয়টিকে আরও জটিল করলেও তাঁর জামিন নিয়ে উপদেষ্টা সরকারের কোনো আগ্রহ ছিল না। এমনও শোনা যাচ্ছিল তাঁকে জেলেই হত্যাও করা হতে পারে। কিন্তু, সরকারের পালাবদল সেটিকে ভেস্তে ঠেলে দিয়েছে। ভারতের মিনিস্ট্রি অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সমাজের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। কিন্তু ভারত বিরোধিতার কারণে সেটি হয়ে ওঠেনি। দুই দেশের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে এই প্রতিক্রিয়া নিছক কূটনৈতিক আনুষ্ঠানিকতা নয়; বরং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার সঙ্গেও যুক্ত। বাংলাদেশ সেটি এখন বুঝতে শুরু করেছে বলে সকলের অনুমান। একজন সন্ন্যাসীকে জেলে আটকে রেখে দেশটির সরকার তার নগ্ন চেহারা তুলে ধরেছে।

অন্যদিকে ইউ এস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট তাদের মানবাধিকার প্রতিবেদন ও বিবৃতিতে বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছে। একইভাবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন নাগরিক অধিকার ও আইনি প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে সংলাপে গুরুত্ব আরোপ করেছে। বাংলাদেশের জন্য এটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন দেশের অন্যতম বৃহৎ রপ্তানি বাজার। আইনি প্রক্রিয়ার অগ্রগতি নিজেই একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা যোগ করেছে। ২০২৫ সালের ৩০ এপ্রিল হাইকোর্ট ডিভিশন অফ দি সুপ্রিম কোর্ট অফ বাংলাদেশ রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীকে শর্তসাপেক্ষ জামিন প্রদান করে এবং নিয়মিত শুনানিতে হাজির থাকার নির্দেশ দেয়। এটি বিচারব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক কাঠামো অনুসরণের ইঙ্গিত বহন করেছিল । কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো আরেকটি মিথ্যা মামলায় তাকে আবারও আটকে রেখে দিয়েছে। তবে চট্টগ্রামে আইনজীবী সইফুল ইসলাম আলিফ হত্যা মামলা-সহ অন্যান্য অভিযোগের তদন্ত চলমান থাকায় তার আইনি ও সামাজিক অবস্থান এখনো অনিশ্চিত।

দেশীয় রাজনৈতিক অঙ্গনেও বিষয়টি তীব্র বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি (বিএনপি) অতীতে দায়ের হওয়া রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার এবং কথিত গণগ্রেপ্তার বন্ধের দাবি তুলেছে। তাদের বক্তব্য হলো, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা মোকাবিলার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হলে তা গণতন্ত্রকে দুর্বল করে। নাগরিক সমাজের একাংশও বিচারব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর জোর দিচ্ছে। সংখ্যালঘু অধিকার প্রশ্নটি এখন কেন্দ্রীয় মাত্রা পেয়েছে। সাংবিধানিক ভাবে অসাম্প্রদায়িক দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও বাস্তব রাজনৈতিক পরিবেশে সংখ্যালঘু নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ রয়ে গেছে ।

কোনো ধর্মীয় নেতার গ্রেপ্তার যদি একটি বৃহত্তর সমাজের মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি তৈরি করে, তবে তা সামাজিক সম্প্রীতি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। আন্তর্জাতিক মহল বিষয়টিকে তাই কেবল আইনশৃঙ্খলার প্রশ্ন হিসেবে নয়, বরং অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসনব্যবস্থার পরীক্ষাস্বরূপ দেখছে।

প্রশ্নটি একটি মৌলিক নীতিতে এসে দাঁড়ায়— আইনের শাসন কি সমানভাবে সবার জন্য প্রযোজ্য? বিচারব্যবস্থা যদি নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থাকে, তবে যেকোনো অভিযোগই আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাধান সম্ভব। কিন্তু যদি বিচারব্যবস্থার ওপর আস্থার সংকট তৈরি হয়, তবে প্রতিটি গ্রেপ্তার বা মামলা দেশের গণতান্ত্রিক বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা ও আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতার জন্য প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ — স্বাধীন তদন্ত সংস্থা, বিচারব্যবস্থার প্রশাসনিক সংস্কার, কার্যকর মানবাধিকার কমিশন এবং রাজনৈতিক প্রতিযোগিতাকে আইনি প্রক্রিয়া থেকে আলাদা রাখার সুস্পষ্ট নীতিমালা। অন্যথায় প্রতিটি বিতর্কিত মামলা কেবল একটি ব্যক্তিকে নয়, পুরো দেশকেই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জবাবদিহির মুখে দাঁড় করাবে।

বাংলাদেশে সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর মুক্তির বিষয়ে বর্তমান সরকার আইনের নিরপেক্ষতা প্রমাণ করতে না পারলে বিশ্ববাসীর কাছে একটি বিশেষ বার্তা যাবে। আর সেটির কারণে বর্তমান সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে কঠিন প্রশ্ন উঠাই স্বাভাবিক। চিন্ময়কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী কোনো অপরাধ করে থাকলে তার উপযুক্ত বিচার হোক। কিন্তু ধর্মীয় বিদ্বেষে ফেব্রিকেটেড বিচার কেউ মেনে নেবে না।

মায়ের বার্ষিক প্রয়াণ দিবসে আমাদের ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁর আত্মার শান্তি কামনার সাথে সাথে সকলকেই সশ্রদ্ধ প্রণাম— আমরা 'দাস পরিবার'।

বিনীত—

মাতৃহারা পুত্র সুদীপ্ত দাস,
পুত্রবধূ তনুশ্রী দাস এবং
ঠাকুরমা-হারা পৌত্র সুতনু দাস
(বাঁশবাড়ি, মালদহ)

হাওড়ায় সপ্তশক্তি সঙ্গম–'নারী তুমি নারায়ণী'

গত ১৮ ফেব্রুয়ারি হাওড়া ময়দানের সন্নিকটে ঐতিহ্যমণ্ডিত শরৎ সদন সভাগৃহে 'বিদ্যা ভারতী অখিল ভারতীয় শিক্ষাসংস্থান' তথা বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত হয় 'সপ্তশক্তি সঙ্গম (মাতৃ সম্মেলন)'। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীমতী সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায়। প্রধান বক্তা হিসেবে ছিলেন বিদ্যা ভারতীর অন্যতম অখিল ভারতীয় সম্পাদিকা এবং সপ্তশক্তি সঙ্গমের রূপকার ও সংযোজিকা শ্রীমতী মধুশ্রী সাওজী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতীর কেন্দ্রীয় সমিতির অন্যতম সম্পাদিকা তথা মহিলা সমন্বয় বিভাগের প্রমুখ শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায়।

প্রধান বক্তা মধুশ্রী দিদি বলেন, শিশুর প্রথম গুরু হলেন তার মা। আদর্শ নাগরিক নির্মাণের গুরুদায়িত্ব মায়েদের ওপর নির্ভরশীল। তিনি আরও বলেন, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি গৌরবের ভাব, মাতৃজাতির সম্মান, আত্মবিশ্বাস, আত্মবোধ ও 'স্ব'-বোধের জাগরণ প্রভৃতি গুণ শিশুর মধ্যে বিকশিত করা অত্যন্ত আবশ্যক। মহাভারতের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ের ৩৪ তম শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নারীর সপ্ত শক্তির কথা বলেছেন। তাই নারীর উচিত নিজেকে দুর্বল না ভেবে সর্বশক্তিমান নারায়ণীরূপে নিজের ছেলে-মেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করা। তাঁরা যেন সমাজে ইতিবাচক চিন্তাভাবনার প্রসারের ওপর জোর দেন। নিজেদের আচার-ব্যবহারের দ্বারা সমাজে যেন শ্রেষ্ঠ বার্তা যায়।

প্রধান অতিথি বিচারপতি সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায় বলেন, বাল্যকালেই তিনি বয়োজ্যেষ্ঠদের থেকে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উচ্চ আদর্শ শিক্ষালাভ করেছেন। তিনি আরও বলেন, ভারতীয় সংস্কৃতি এতটাই সমৃদ্ধ যে, জীবনের আদর্শ পাঠ ওখান থেকেই লাভ করা সম্ভব। তিনি এটাকে গর্বের বিষয় বলে উল্লেখ করে বলেন, আমরা এই পবিত্র ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছি, যেখানে মা সারদা, রানি রাসমণি আদি মহীয়সী নারীরা সারা বিশ্বে নারী জাগরণের পথপ্রদর্শক। বক্তারা একসুরে বলেন, মাতৃশক্তিই সমাজ ও রাষ্ট্র নির্মাণের ভিত্তিস্বরূপা। তাঁদের দ্বারা ভারতে ইতিবাচক সংস্কারের মাধ্যমে ভবিষ্যতের শক্তিশালী প্রজন্ম তৈরি করা সম্ভব। অনুষ্ঠানে এক হাজারেরও বেশি মাতা-ভগিনী সপ্তশক্তি জাগরণের সংকল্প গ্রহণ করেন। শেষে বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

দেগঙ্গার কলাপোলে বহুকণ্ঠে গীতাপাঠ ও গীতাযজ্ঞ অনুষ্ঠান

গত ১৯ ফেব্রুয়ারি উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গার কলাপোলে নব উদয়ন সঙ্ঘ খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয় গীতাপাঠ, গীতাদান ও গীতাযজ্ঞ অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন অধ্যাপক ড. কল্যাণ চক্রবর্তী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আচার্য শ্রীসঞ্জয় শাস্ত্রী মহারাজ, স্বামী অমৃতানন্দ পুরী এবং শ্রীশ্রী ১০৮ সুদেবগিরি নাগাবাবা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মতিলাল তীর্থ সেবা মিশন আশ্রমের সম্পাদক মনোজ কুমার মণ্ডল, সংস্কার ভারতীর ভরত চন্দ্র কুণ্ডু, রাষ্ট্রীয় সংহতির সমীর গুহরায়, জয়ন্ত দাস, শ্রীমতী দীপ্তি ওঝা, দিতি ভট্টাচার্য প্রমুখ। মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে প্রদীপ প্রজ্বলন করে সরস্বতী বন্দনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। মূল আকর্ষণ ছিল বিড়ার গুরুকুল থেকে আগত আর্য ছাত্র-সহ শিক্ষক সুভাষ মজুমদারের পরিচালনায় শান্তিযজ্ঞ ও গীতাপাঠ। এরপর শ্রীসঞ্জয় শাস্ত্রী মহারাজ উপস্থিত সবাইকে তাঁর ভাষণে হিন্দুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করে হিন্দুদের পথনির্দেশ করেন।

একসময় বিশিষ্ট লেখক শ্যামল দাঁ তাঁর ভ্রমণকাহিনি বিষয়ক পুস্তক 'পৃথিবীর স্বর্গ' এবং কাব্যগ্রন্থ 'আমিই সেই মেয়ে' শ্রীসঞ্জয় শাস্ত্রী মহারাজের হাতে তুলে দেন। শ্রীভরত কুণ্ডুর কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন দিতি ভট্টাচার্য। পরিশেষে সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

হাওড়ায় 'সনাতনী অ্যাডভোকেট একত্রীকরণ সমিতি'র আইনজীবী সম্মেলন

গত ১৩ ফেব্রুয়ারি হাওড়া শহরে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)-এর সভাকক্ষে 'সনাতনী অ্যাডভোকেট একত্রীকরণ সমিতি'র উদ্যোগে হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট, উলুবেড়িয়া সাব-ডিভিশনাল কোর্ট এবং আমতা সাব-ডিভিশনাল কোর্টের সনাতনী আইনজীবীদের এক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র প্রচারক রমাপদ পাল। বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন ইনকাম ট্যাক্স বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সিনিয়র আইনজীবী তপন কুমার নাগ, উলুবেড়িয়া কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সিনিয়র আইনজীবী শুকদেব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট জাজেস কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী বিনয়ভূষণ আচার্য। এছাড়াও ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ সহপ্রান্ত কার্যবাহ সুনীল সিংহ, হাওড়া মহানগর প্রচারক অর্জুন মণ্ডল।

প্রদীপ প্রজ্বলন এবং ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের পর উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন আইনজীবী চন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়। প্রধান বক্তা শ্রীপাল তাঁর ভাষণে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির নিরিখে অধিবক্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে আলোকপাত করেন। 'সনাতনী অ্যাডভোকেট একত্রীকরণ সমিতি'র আহ্বায়িকা আইনজীবী ধীশ্বরী নাগের ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং আইনজীবী দেবরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে বন্দে মাতরম্ পরিবেশনার পর সম্মেলনের সমাপ্তি হয়। সম্মেলন সঞ্চালনা করেন আইনজীবী সৌমেন সরকার।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সামাজিক সমরসতা অভিযানের কেন্দ্রীয় বৈঠক

গত ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সামাজিক সমরসতা অভিযানের কেন্দ্রীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। বৈঠকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সাংগঠনিক ৩৫টি প্রান্ত থেকে ১১৫ জন কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেন। পূর্বক্ষেত্র থেকে ক্ষেত্র সমরসতা প্রমুখ গৌতম সরকার-সহ ৮ জন কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেন। কার্যকর্তাদের পথনির্দেশ করেন সমরসতা অভিযানের কেন্দ্রীয় প্রমুখ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবজীভাই রাওত, কেন্দ্রীয় সহ সংগঠন মহামন্ত্রী তথা সমরসতা অভিযানের পালক কার্যকর্তা শ্রী বিনায়ক দেশপাণ্ডেজী, সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক রাঘবলুজী, সন্ত ভরতভূষণজী মহারাজ প্রমুখ। বক্তারা সকলেই ভেদভাবহীন সমরস সমাজ নির্মাণের মাধ্যমে 'বিশ্বগুরু ভারত'-এর লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়ার কথা বলেন। সঙ্ঘ শতবর্ষে পঞ্চ পরিবর্তন কীভাবে জীবনে অভ্যাসে পরিণত করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা হয়। এবছর ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৭ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির আন্দোলনের রূপকার স্বর্গীয় অশোক সিংহলজীর জন্মশতবর্ষ পালিত হবে, সেখানে সামাজিক সমরসতার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হবে। আগের তুলনায় গত বছরে ঋষি বাল্মীকি জয়ন্তী, সন্ত রবিদাস জয়ন্তী, ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকর জয়ন্তী অনেক বেশি স্থানে পালিত হয়েছে। হিন্দু মিত্র পরিবার, সমরসতা যজ্ঞ, আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে শ্রীদেবজী ভাইয়ের 'রাষ্ট্র রক্ষা কবচ সমরসতা' পুস্তক-সহ আরও কয়েকটি পুস্তক উন্মোচন করা হয়।

বেলেঘাটায় 'বিরাট হিন্দু সম্মেলন'

গত ১ ফেব্রুয়ারি মাঘীপূর্ণিমার দিন কলকাতা মহানগরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বেলেঘাটা নগরের ব্যবস্থাপনায় বেলেঘাটা সুভাষ সরোবরের নিকট বালাজী মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয় 'বিরাট হিন্দু সম্মেলন'। মন্দির চত্বর ফুল ও গৈরিক ধ্বজ দ্বারা সাজিয়ে তোলা হয়। এই বিরাট হিন্দু সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক সারদাপ্রসাদ পাল, কলকাতা মহানগরের পূর্বভাগ সহ-সঙ্ঘচালক বিশ্বনাথ নন্দী, পূর্বভাগ প্রচারক ডাঃ পলাশ দলুই, পূর্বভাগ পরিবার প্রবোধন প্রমুখ অজয় দাশগুপ্ত-সহ অন্যান্য স্বয়ংসেবক এবং অসংখ্য সাধারণ মানুষ। পূজা ও হোমযজ্ঞের মাধ্যমে এদিনের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। হোমযজ্ঞ শেষে শতকণ্ঠে গীতাপাঠ পরিচালনা করেন গৌড়ীয় মঠের সন্ন্যাসী স্বামী অচ্যুতানন্দজী মহারাজ। মাইকের মাধ্যমে গীতাপাঠ ও ভক্তিগীতি পরিবেশন করা হয়। গীতাপাঠের বিরতির পর ফল, সিন্নি প্রসাদ ও খিচুড়ি ভোগ বিতরণ করা হয়। প্রায় ২৫০০ জন সনাতনী প্রসাদ গ্রহণ করেন। অসংখ্য মানুষ বাড়িতে প্রসাদ নিয়ে যান। সকলের সহযোগিতায় এই সম্মেলনটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়।

ফঃ ৪

সঙ্ঘ শতাব্দীবর্ষে শ্রীরামপুর শহরে বিশিষ্ট নাগরিক সম্মেলন

গত ৮ ফেব্রুয়ারি হুগলী জেলায় শ্রীরামপুর টাউন হলে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে এক বিশিষ্ট নাগরিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এদিনের সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সম্পর্ক প্রমুখ বিদ্যুৎ মুখোপাধ্যায়। সঙ্ঘের ১০০ বছরের যাত্রাপথ ও পঞ্চ পরিবর্তনের বিষয়ে সম্মেলনে উপস্থিত বিশিষ্টজনদের সামনে তিনি তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এরপর প্রশ্নোত্তর কার্যক্রমে বিশিষ্ট নাগরিকদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত বেশ কিছু প্রশ্নের সমাধানও তিনি

তুলে ধরেন। কানায় কানায় পূর্ণ সভাগৃহে উপস্থিত নাগরিকদের মধ্যে সঙ্ঘ সম্পর্কে বিশেষ ঔৎসুক্য লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া এই সভায় উপস্থিত ছিলেন হুগলী জেলা সঙ্ঘচালক বানোয়ারীলাল সোমানী ও জেলা সহ-সঙ্ঘচালক আনন্দমোহন দাস। এদিন সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রীরামপুর নগর কার্যবাহ সূর্যশেখর হালদার। অনুষ্ঠানের শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রীরামপুর নগর সম্পর্ক প্রমুখ বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়। প্রজ্ঞা প্রবাহ, মধ্যবঙ্গ প্রান্তের কার্যকর্তা দেবাশিস ঘোষের কণ্ঠে বন্দে মাতরম্ সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

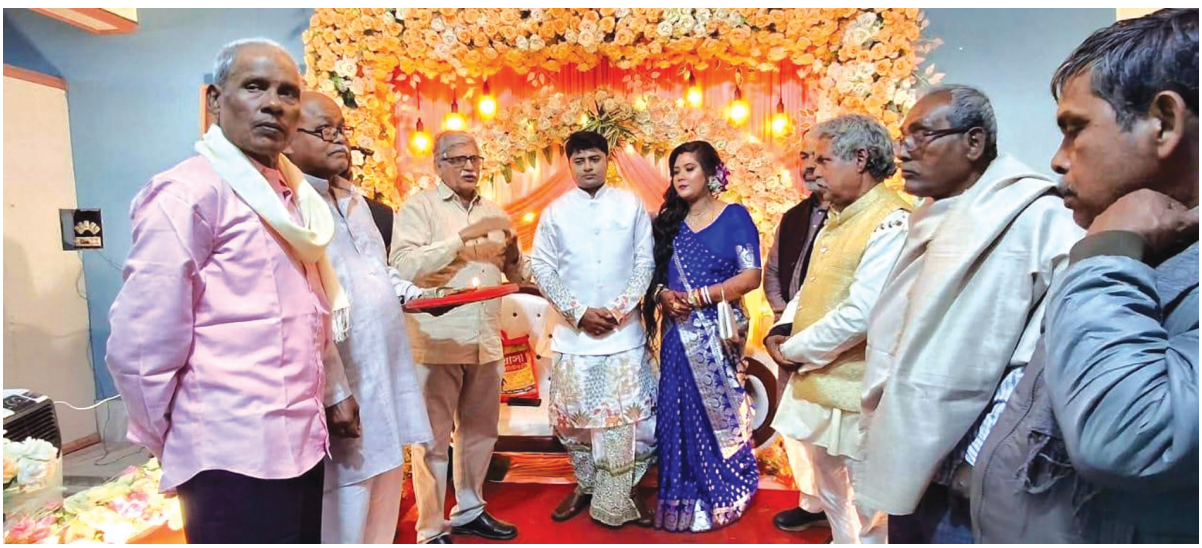

ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের প্রান্ত প্রচার প্রমুখ তথা ভারতীয় কিষাণ বার্তা পত্রিকার সম্পাদক মিলন খামারিয়া গত ৮ ফেব্রুয়ারি তাঁর বিবাহের বধূবরণ অনুষ্ঠানে নববধূর সঙ্গে একত্রে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের প্রান্ত কার্যকর্তাদের হাতে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন। ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকর্তা কল্যাণ কুমার মণ্ডল মঙ্গলনিধির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক অনিল রায়, উত্তর ও পূর্বক্ষেত্রের সংগঠন সম্পাদক শ্রীনিবাসজী প্রমুখ। তাঁরা নবদম্পতির হাতে ভারতমাতার প্রতিকৃতি প্রদান করেন। মঙ্গলনিধির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকর্তা কল্যাণ কুমার মণ্ডল।

সঙ্ঘ শতবর্ষে চুঁচুড়ায় বিশিষ্ট নাগরিক সম্মেলন

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি হুগলী জেলার চুঁচুড়া শহরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ-সরকার্যবাহ অরুণ কুমারজীর উপস্থিতিতে বিশিষ্ট নাগরিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় দেড় শতাধিক বিশিষ্ট নাগরিক এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় সঙ্ঘের বিচারধারা ও ১০০ বছরের যাত্রাপথকে সামনে রেখে অরুণ কুমারজী সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন। সভার অন্তিম লগ্নে প্রশ্নোত্তর কার্যক্রমে অরুণ কুমারজী বিশিষ্ট নাগরিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হুগলী বিভাগ সঙ্ঘচালক সুনীল কুমার বাগ ও জেলা সঙ্ঘচালক বানোয়ারীলাল সোমানী। পরিশেষে রাষ্ট্রগীত 'বন্দে মাতরম্' সংগীতের মধ্য দিয়ে সভার পরিসমাপ্তি ঘটে।

হুগলীর সিমলাগড়ে বিশিষ্ট নাগরিক সম্মেলন

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে হুগলী জেলার সিমলাগড়ে এক নাগরিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র প্রচারক রমাপদ পাল। সম্মেলনে পাণ্ডুয়া-সহ পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে ১৫০ জন বিশিষ্ট নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত ভাষণ রাখেন সঙ্ঘের হুগলী জেলা সহ-সঙ্ঘচালক আনন্দমোহন দাস। শ্রীপাল তাঁর ভাষণে সঙ্ঘের বিচারধারা এবং ১০০ বছরের যাত্রাপথে সমাজে তার ভূমিকা বিষয়ে আলোকপাত করেন। অন্তিম পর্বে তিনি উপস্থিত নাগরিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দান করেন। বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতের মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি হয়।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে গত ২২ ফেব্রুয়ারি পুরুলিয়া শহরের ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে বিশিষ্ট নাগরিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সম্পর্ক প্রমুখ বিদ্যুৎ মুখোপাধ্যায়।

সেন্টার অফ বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেসের বার্ষিক সাধারণ সভা

২০২৫ সালের ১ মার্চ চন্দ্রকেতুগড় শহীদুল্লাহ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের পূর্বতন অধ্যক্ষ ড. নারায়ণ দাশের ছাত্র-ছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসবের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে স্কুল স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হাতে কলমে বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্র--- 'সেন্টার অফ বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস — অ্যান ইনস্টিটিউশন অফ লার্নিং' (সিবিএস)। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি উত্তর ২৪ পরগনায় বসিরহাট-স্থিত আনন্দলোক মিশনে এই সংস্থার দ্বিতীয় বর্ষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সংস্থার সভাপতি ড. নারায়ণ দাশ-সহ তাঁর ছাত্র-ছাত্রী তথা সংস্থার সদস্য-সদস্যারা উপস্থিত ছিলেন। সভায় সকলের উপস্থিতিতে সংস্থার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়। আলোচনা চলাকালীন উদ্বোধন করা হয় সংস্থার একটি ওয়েব পেজ। এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কার্যক্রম সংক্রান্ত আলোচনার পর প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আগামীদিনে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, সেই সম্পর্কিত একটি রূপরেখা তৈরি করা হয়। জীববিজ্ঞান কেন্দ্র বিভাগসমূহ পরিচালন, শিশুদের জন্য বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির কার্যক্রম, স্বনিযুক্তির লক্ষ্যে মৎস্যচাষ-সহ বিভিন্ন কৃষিকাজ, সামাজিক বনায়ন ইত্যাদির প্রশিক্ষণ-সহ জনসাধারণের জন্য বিজ্ঞানের কার্যক্রম, বিজ্ঞান চর্চায় প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে হাতে-কলমে কাজের ওপর গুরুত্বদান, বিজ্ঞান চেতনার প্রসার, বিদ্যালয় স্তরের পাঠ্যক্রমের আধুনিকীকরণ, ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজনশীলতা বিকাশ, বিজ্ঞানভিত্তিক প্রকল্পের মতো সিবিএসের নয়টি বিভাগের বিভিন্ন কাজকর্মের পরিকল্পনা কার্যকর করার বিষয়ে এদিনের সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে গত ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত সংস্থাটির পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ১৮টি স্কুলে এক দিবসীয় ওরিয়েন্টেশন ক্যাম্প করা সম্ভব হয়েছে বলে জানান ড. নারায়ণ দাশ। প্রতিটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা-সহ অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকা, স্কুল পরিচালন সমিতির সদস্য ও সহকারী কর্মীরা বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বিজ্ঞান ভাবনা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সংস্থার প্রয়াসে সহযোগিতার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। ভবিষ্যতে দুই-তিনদিনের ক্যাম্পের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সমাজকে পরিবেশবান্ধব ও বিজ্ঞানমুখী করার প্রয়াস সংস্থার পক্ষ থেকে অব্যাহত থাকবে বলে জানান ড. নারায়ণ দাশ। সময় সংক্ষেপের কারণে আবার একটি ছোটো ও বর্ধিত আলোচনাসভার মাধ্যমে নতুন কমিটি গঠনের জন্য এদিনের সভায় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সভায় উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা তাঁদের সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেন। সকলের সাহচর্যে এদিনের অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গীণ সুন্দর হয়ে ওঠে।

এই সভায় উপস্থিত ছিলেন অজয় বাইন, ড. জগন্নাথ দাস, অর্ণব রায়, সুব্রত দে, সন্দীপন সেন, শমীক চক্রবর্তী, ড. কৃষ্ণা নাথ, চায়না মিত্র, নূপুর দাস, নির্মল কুমার মণ্ডল, হিরণ্ময় মণ্ডল, অসীম ঘোষ, লিলি ঘোষ, পার্থ রায়, তাপস কুমার রায়, প্রবীর কুমার দাস, সনৎ কুমার দাশ, বনানী প্রধান, উদয় কুমার দাস, ড. কৃষ্ণা ঘোষ, অচিন্ত্য কুমার বিশ্বাস, কৃষ্ণগোপাল মণ্ডল, হরিপদ বর্মণ, অমিত ঘোষ, সুকুমার দাস, অমল দাস, চপল কুমার বিশ্বাস, সন্তোষ দে, অভিজিৎ সমাদ্দার, সাহানুর খাতুন, মোকিমা খাতুন, ফৌজিয়া খানম, ফিরোজ ইসলাম, সংবাদ সাপ্তাহিক 'স্বস্তিকা'র সম্পাদকীয় বিভাগের সদস্য অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়, মৎস্যবিজ্ঞানী ড. আবুল হাসান প্রমুখ বিশিষ্টজন। সভা সমাপ্তির পর উপস্থিত সকলে সহ-ভোজনে মিলিত হন।

With Best Compliments From -

A

Well Wisher

সহস্রাব্দের ঝড় পেরিয়ে উড্ডীন সোমনাথের বিজয়কেতন

সোমনাথ গোস্বামী

গুজরাটের সৌরাষ্ট্র উপকূলে আরব সাগরের তীরে (প্রভাস পাটন) অবস্থিত সোমনাথ মন্দির শুধু একটি মন্দির নয়, এটি ভারতীয় সভ্যতার অনাদি আস্থার প্রতীক, যা কালের সীমাকে উপেক্ষা করে স্থিতিশীল। এই তীর্থ আমাদের সংস্কৃতি ও চেতনার সেই মূল মন্ত্র, যা বারবার আঘাত সয়েও নবীন শক্তিতে মাথা তুলে দাঁড়াতে জানে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য, পুরাণ ও সংস্কৃত শ্লোকে এর গুরুত্ব বারবার ঘোষিত হয়েছে। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে সোমনাথই হলো 'আদি জ্যোতির্লিঙ্গ'। স্কন্দ পুরাণের প্রভাস খণ্ডে এই তীর্থের মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে। এটি সেই পীঠ, যেখানে চন্দ্রদেব তাঁর অভিশাপ মুক্তি এবং তেজ ফিরে পাওয়ার জন্য তপস্যা করেছিলেন। সোমনাথ শব্দের মধ্যেই সেই সত্য নিহিত— সোম (চন্দ্র) + নাথ (প্রভু)। তিনি কেবল চন্দ্রের প্রভু নন, আমাদের মন (সোম) এবং আত্মার (নাথ) অধীশ্বর। এই ভাবটিই জনমানসে গভীর আধ্যাত্মিক সংযোগ স্থাপন করে। শিব পুরাণের কোটিরুদ্র সংহিতায় বলা হয়েছে :

'সৌরাষ্ট্রে সোমনাথং চ শ্রীশৈলেমল্লিকার্জুনম্।
উজ্জয়িন্যাং মহাকালমোঙ্কারমমলেশ্বরম্।।'

অর্থাৎ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের বর্ণনার শুরুতেই সোমনাথের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যা এর প্রাচীনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। এই শ্লোকটি কেবল একটি ভৌগোলিক নির্দেশিকা নয়, এটি ভারত জুড়ে ছড়িয়ে থাকা আধ্যাত্মিক ঐক্য ও ঐতিহ্যের এক মহৎ ঘোষণা। এছাড়াও লোকবিশ্বাসে একটি সুপরিচিত শ্লোক প্রচলিত :

'সোমলিঙ্গং নৃবাহণং সর্বপাপহং কলৌ।
সৌরাষ্ট্রস্থং শিবং নিত্যং সোমনাথং নমাম্যহম্।।'

অর্থাৎ 'যিনি সহস্র সূর্যের মতো দীপ্তিমান, সেই সোমনাথের দর্শন কলিযুগে মানুষের সমস্ত পাপ ও দুর্ভাগ্য দূর করে। আমি সৌরাষ্ট্রে অবস্থিত সেই নিত্য শিব সোমনাথকে প্রণাম করি।' প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থ এবং আঞ্চলিক গাথাগুলি সোমনাথের ভৌগোলিক অবস্থানকে কেবল একটি তীর্থক্ষেত্রে হিসেবেই নয়, বরং সমগ্র ভারতীয় জনমানসের হৃদয়ের কেন্দ্রীয় স্থান হিসেবে চিহ্নিত করে। বৈদিক কাল থেকে শুরু করে পুরাণ ও মহাকাব্য পর্যন্ত, সোমনাথের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক গুরুত্ব অবিচ্ছিন্নভাবে স্বীকৃত হয়ে এসেছে। এটি কেবল ধর্মীয় বিশ্বাস নয়, বরং ভারত উপমহাদেশের সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা ও ঐতিহাসিক স্থিতিশীলতার এক অপরিহার্য ভিত্তি। সোমনাথ মন্দিরের ইতিহাসে সবচেয়ে মর্মান্তিক অধ্যায়টি রচিত হয় গজনির সুলতান মাহমুদের হাতে। এর ধনসম্পদ ও অসামান্য স্থাপত্যের খ্যাতি মধ্য এশিয়ার শাসকদের কাছে পৌঁছালে তাদের মনে অপ্রতিরোধ্য দুরভিসন্ধি জন্ম হয়।

১০২৫ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে মাহমুদ সিন্ধু নদ পার হয়ে গুজরাটের দিকে যাত্রা করে এবং ১০২৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে নেমে আসে ভারতের ইতিহাসে অন্যতম বর্বরোচিত আক্রমণ। এটি কেবল একটি সামরিক অভিযান নয়, বরং ইসলামের নামে ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলে আঘাত হানার সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা। সমসাময়িক এবং পরবর্তী যুগের ঐতিহাসিক যেমন আল-বিরুনী, আল-উতবি এবং ফেরেশতার বিবরণীতে এই আক্রমণের ভয়াবহতা বিস্তারিতভাবে উঠে এসেছে। ১০২৬ সালের জানুয়ারি মাসে সোমনাথ মন্দিরে চূড়ান্ত আঘাত হানা হয়। মন্দির রক্ষা করতে আসা প্রায় পঞ্চাশ হাজার নিরস্ত্র নাগরিক ও পুণ্যার্থীকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল প্রভাস পাটন এবং আরব সাগরের তীর। মাহমুদ কেবল লুঠপাট করেই ক্ষান্ত হননি; শিবলিঙ্গের টুকরোগুলি গজনিতে নিয়ে গিয়ে মক্কার জামে মসজিদের প্রবেশপথে পুঁতে রাখার আদেশ দেয়, যাতে প্রতি নামাজির পদতলে সেগুলি দলিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল কেবল আর্থিক লুণ্ঠন নয়, বরং সাংস্কৃতিক ও মজহবি 'বিজয়ের' চরম ঔদ্ধত্য প্রকাশ করা।

ঐতিহাসিক আল-উতবি এবং অন্যান্য সমসাময়িক বিবরণী অনুসারে,

সোমনাথ মন্দির থেকে লুণ্ঠন করা হয়েছিল আনুমানিক ২০ লক্ষ দিনার মূল্যের সম্পদ (স্বর্ণ, রৌপ্য ও মূল্যবান রত্ন)। সেই সময়ের বাজার মূল্য এবং স্বর্ণের পরিমাণের (যা প্রায় ৮.৫ মেট্রিক টন হতে পারে) ভিত্তিতে এই বিপুল পরিমাণ সম্পদ বর্তমানে প্রায় ৫,৫০০ কোটি টাকা বা তারও বেশি মূল্যের সমতুল্য। কথিত, লুণ্ঠিত ধনসম্পদ বহন করার জন্য হাজার হাজার উট ব্যবহার করা হয়েছিল। এই বিপুল সম্পদ লুণ্ঠনের পাশাপাশি অসংখ্য সাধারণ মানুষের উপর চালানো হয়েছিল অমানবিক অত্যাচার। মন্দির চত্বরটি পরিণত হয়েছিল ধ্বংসস্তূপ এবং মৃতদেহের স্তূপে। লুণ্ঠন ও ধ্বংসের এই কাজ মধ্যযুগীয় বর্বরতার এক চরম নিদর্শন, যা শত শত বছর ধরে ভারতীয় চেতনায় গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল। মাহমুদের এই অভিযান পরবর্তী সময়ে অন্যান্য আক্রমণকারীদের কাছেও সোমনাথকে আক্রমণের 'লক্ষ্য' হিসেবে তুলে ধরেছিল।

গজনির মাহমুদের আক্রমণের পর থেকেই সোমনাথ মন্দিরকে বারবার বিদেশি শাসকের আক্রমণের শিকার হতে হয়। মন্দিরটি ছিল হিন্দু সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু, তাই প্রতিটি আক্রমণকারীই এটিকে হিন্দু আধ্যাত্মিক চেতনার উপর আঘাত হানার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। মাহমুদের প্রস্থানের পর স্থানীয় হিন্দু শাসকেরা মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করেন, কিন্তু ১৩০৮ খ্রিস্টাব্দে দিল্লি সুলতানি শাসক আলাউদ্দিন খিলজির গুজরাট অভিযানে তার সেনাপতি উলুঘ খান সোমনাথ মন্দির পুনরায় আক্রমণ, লুণ্ঠন ও ধ্বংস করে। এই আক্রমণের ফলেও মন্দিরের স্থাপত্যের চরম ক্ষতি হয় এবং এর পবিত্রতা লঙ্ঘিত হয়। ১৩৯৫ খ্রিস্টাব্দে গুজরাটের সুলতান মুজফ্ফর শাহ আবার মন্দিরটি ধ্বংস করে। এই বার বার ধ্বংসের মুখেও স্থানীয় রাজন্যবর্গ এবং সাধারণ মানুষের উদ্যোগে মন্দিরটিকে রক্ষার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও চূড়ান্ত আঘাত আসে মুঘল বাদশা আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে। ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে সে সোমনাথ মন্দির সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার এবং সেই জায়গায় একটি মসজিদ নির্মাণের আদেশ দেয়। আওরঙ্গজেবের নির্দেশ ছিল অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট— ধ্বংসের কাজ এমনভাবে সম্পন্ন করতে হবে যেন মন্দিরটি আর কোনোদিন পুনরুদ্ধার করা সম্ভব না হয়। ঐতিহাসিকদের মতে, এই ধ্বংস এতটাই ব্যাপক ছিল যে মনে করা হয়েছিল মন্দিরটি আর কোনোদিন তার পূর্বের স্থানে ফিরতে পারবে না। এই প্রতিটি আক্রমণ ভারতীয় জনগণের মনে গভীর দুঃখ ও যন্ত্রণার সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু একই সঙ্গে জন্ম দিয়েছিল পুনর্নির্মাণের এক অদম্য স্পৃহার, যা প্রমাণ করে যে ভারতীয় সভ্যতাকে তার মূল থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়।

সোমনাথের ইতিহাস ধ্বংসের নয়, প্রতিরোধের ও পুনর্নির্মাণের। প্রাচীনকাল থেকেই চালুক্য রাজবংশের রাজা কুমারপালের মতো শাসকরা মন্দিরটিকে বারবার মেরামত ও পুনর্নির্মাণ করেছেন। এই ধারাবাহিক প্রচেষ্টার মধ্যে পরাধীন ভারতে এক উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নেন ইন্দোরের মহারানি অহল্যাবাই হোলকর। ১৭৮২ সালে তিনি পুরোনো ধ্বংসস্তূপের কাছেই একটি ছোটো মন্দির নির্মাণ করেন, যা ভক্তদের আস্থার প্রতীক হিসেবে থাকে। স্বাধীনতার পর, সোমনাথ মন্দিরে পুনর্নির্মাণ একটি জাতীয় সংকল্পে পরিণত হয়। ১৯৪৭ সালের ১২ নভেম্বর, জুনাগড়কে ভারতে অন্তর্ভুক্ত করার পর, তৎকালীন উপ-প্রধানমন্ত্রী তথা স্বারাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সোমনাথের ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শনে যান। তিনি অত্যন্ত আবেগতাড়িত হয়ে মন্দিরটিকে তার আদি গৌরবে ফিরিয়ে আনার প্রতিজ্ঞা করেন। তিনি এটিকে শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় স্থাপনা নয়, বরং জাতীয় সম্মান ও আত্মমর্যাদার প্রতীক হিসেবে দেখেন। প্যাটেলজীর উদ্যোগে, কেএম মুন্সিকে নিয়ে সোমনাথ ট্রাস্ট গঠিত হয়। গান্ধীজীর পরামর্শ মেনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে এই পুনর্নির্মাণ কাজ হবে সম্পূর্ণভাবে জনগণের অনুদানে, যাতে নবগঠিত দেশের কোষাগারের উপর কোনো বোঝা না পড়ে। যদিও ১৯৫০ সালে সর্দার প্যাটেল প্রয়াত হন, তবুও তাঁর সংকল্প বাস্তবায়নের গুরুদায়িত্ব কেএম মুন্সির নেতৃত্বে ট্রাস্ট বহন করে। এর ফলস্বরূপ, ১৯৫১ সালে মন্দিরটি উদ্বোধনের জন্য প্রস্তুত হয়, যা ভারতীয় জনগণের সংকল্প ও আস্থার বিজয়ের এক স্পষ্ট বার্তা দেয়।

সোমনাথ মন্দিরের উদ্বোধনকে ঘিরে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং প্রথম রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদের মধ্যে এক ঐতিহাসিক মতপার্থক্য তৈরি হয়। জওহরলাল নেহরু সোমনাথ মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটনে যেতে নিষেধ করেন। তিনি এটাকে হিন্দু পুনরুত্থান হিসেবে বর্ণনা করেন। কিন্তু ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ নেহরুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন। তিনি জবাব দেন যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে এবং জনগণের আস্থা ও আবেগের প্রতি সম্মান জানাতে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে প্রস্তুত। তিনি বলেছিলেন, 'ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং জনজীবনের প্রতীকী গুরুত্বের মধ্যে পার্থক্য আছে।' তিনি যুক্তি দেন যে সোমনাথের পুনর্নির্মাণ কেবল একটি ধর্মীয় কাজ নয়, বরং বহু শতাব্দীর অপমান ও ধ্বংসের পর জাতীয় আত্মমর্যাদা পুনরুদ্ধার করার একটি প্রতীকী পদক্ষেপ। ১৯৫১ সালের ১১ মে, রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ এই ঐতিহাসিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন এবং নিজ হাতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর এই পদক্ষেপ স্বাধীন ভারতে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার এবং রাষ্ট্রীয় আদর্শের প্রতি বিশ্বাসের এক অনন্য উদাহরণ স্থাপন করে, যা জনগণের গভীর বিশ্বাসকে স্বীকৃতি দেয়। সোমনাথ ট্রাস্টের তত্ত্বাবধানে এবং গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহে মন্দিরটির আধুনিকীকরণ এবং একে বিশ্বমানের তীর্থস্থান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বহুবিধ উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সোমনাথের সামগ্রিক বিকাশ চোখে পড়ার মতো।

উল্লেখযোগ্য উদ্যোগগুলির মধ্যে রয়েছে, সমুদ্র উপকূল বরাবর 'সোমনাথ বিচ সরণি' নির্মাণ, অত্যাধুনিক 'দর্শন ভবন' নির্মাণ এবং মন্দিরের চূড়া ও অন্যান্য অংশে স্বর্ণের ব্যবহার। তীর্থযাত্রীদের সুবিধার্থে ট্রাস্টের উদ্যোগে তৈরি করা হয়েছে আধুনিক অতিথি নিবাস, যেখানে ভক্তরা স্বল্পমূল্যে থাকার সুবিধা পান। এটি কেবল মন্দির নয়, বরং সমগ্র প্রভাস পাটন অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশে সহায়তা করেছে। সোমনাথ মন্দির বর্তমানে গুজরাট পর্যটন বিভাগের অন্যতম আকর্ষণীয় কেন্দ্র। মন্দিরের তথ্য অনুযায়ী, প্রতি বছর এখানে প্রায় পঁচানব্বই লক্ষ থেকে এক কোটি ভক্ত ও পর্যটকের সমাগম হয়। এই বিপুল সংখ্যক মানুষের আগমন সোমনাথের আধ্যাত্মিক আকর্ষণ এবং উন্নত পরিকাঠামোর ফলশ্রুতি। গুজরাট সরকার সোমনাথকে 'আধ্যাত্মিক পর্যটন ত্রিভুজ'-এর অংশ হিসেবে তুলে ধরেছে, যা আন্তর্জাতিক পর্যটকদের কাছেও এই স্থানটির গুরুত্ব অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। উন্নত সড়ক ও রেল যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে পর্যটকদের যাতায়াত আরও সহজ করা হয়েছে। সোমনাথের এই নবজাগরণ প্রমাণ করে যে এক হাজার বছরের ধ্বংসের চেষ্টা সত্ত্বেও, ভারতীয় সংস্কৃতির মূল স্রোত অক্ষত ও শক্তিশালী। বহুবার ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েও, সোমনাথ মন্দির সনাতনী হিন্দু সভ্যতার সেই অজেয় প্রতীক হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যা শেখায়— ঘৃণা ও বিনাশ ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু আস্থা ও সৃষ্টি চিরন্তন। □

মানবোন্নতির পথে ভ্রান্ত সাধনা থেকে সত্য দর্শন

।। পর্ব ৩।।

অনামিক রায়

মানুষ সাধারণত নিজেকে যে রূপে জানে, সেই জানাটাই তার সমগ্র জীবনের দিশা নির্ধারণ করে। মানুষ কীভাবে ভাববে, কীসে সে আনন্দ খুঁজবে, কীসে সে ভয় পাবে, কীসে সে নিরাপত্তা বা বন্ধন অনুভব করবে— সবকিছুই নির্ভর করে তার আত্মপরিচয়ের ধারণার উপর। আত্মপরিচয় এখানে কেবল একটি তাত্ত্বিক ধারণা নয়; এটি মানুষের অনুভব, সিদ্ধান্ত ও কর্মপ্রবাহের এক অদৃশ্য কেন্দ্র। মানুষ নিজের সম্পর্কে যা বিশ্বাস করে, যা ধারণা করে, জীবন আসলে সেই ধারণা বিশ্বাসেরই ধারাবাহিক প্রকাশ।

অধিকাংশ মানুষ নিজের পরিচয় সীমাবদ্ধ করে রাখে শরীর ও মনের মধ্যেই। সে ভাবে, ‘‘আমি এই দেহ, এই অনুভূতি, এই চিন্তা, এই স্মৃতি।’’ এই বিশ্বাস ধীরে ধীরে এতটাই স্বাভাবিক হয়ে ওঠে যে মানুষ আর কখনো এটিকে প্রশ্ন করেই দেখে না। এই সীমাবদ্ধ পরিচয় থেকেই জন্ম নেয় এক গভীর দেহাভিমান; এক সূক্ষ্ম কিন্তু অত্যন্ত শক্ত অহংকার। এই অহংকার মানুষকে জগতের সঙ্গে এমনভাবে বেঁধে ফেলে যে সে আর নিজের প্রকৃত স্বরূপের দিকে ফিরে তাকানোর অবকাশ পায় না।

জীবন তখন হয়ে ওঠে দেহকে রক্ষা করা, মনকে সন্তুষ্ট করা এবং এই দুইয়ের মধ্যেই নিরাপত্তা খোঁজার এক অবিরাম সংগ্রাম। এই দেহাভিমানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকে জগৎকে ভোগের বস্তু হিসেবে দেখার প্রবণতা। মানুষ জগৎকে আর উপলব্ধির ক্ষেত্র হিসেবে দেখে না; দেখে ভোগের উপকরণ হিসেবে।

ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যা পাওয়া যায়— রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ সেগুলোকেই সে জীবনের প্রধান আনন্দ বলে মনে করতে শুরু করে। তার কাছে সুখ মানে হয়ে ওঠে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, আর দুঃখ মানে ইন্দ্রিয়ের অপূর্ণতা বা বঞ্চনা। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেয় যে সুখের মূল উৎস ইন্দ্রিয়েই নিহিত এবং ইন্দ্রিয়কে যত বেশি সন্তুষ্ট করা যায়, জীবন ততই পরিপূর্ণ।

কিন্তু এই ধারণার ভেতরেই লুকিয়ে থাকে এক গভীর ভ্রান্তি। একটু গভীরভাবে দেখলেই বোঝা যায়, ইন্দ্রিয় কখনোই স্বতন্ত্রভাবে সুখ বা দুঃখ সৃষ্টি করে না। বাস্তবে ইন্দ্রিয়ের কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গেলেও কোনো অসুস্থতা, অতিরিক্ত ক্লান্তি বা অচেতনতার কারণে মন তার ভেতরের ভোগবাসনা কখনো বন্ধ করে দেয় না।

ঘুমের মধ্যেও মানুষ স্বপ্ন দেখে, স্বপ্নের মধ্যেও সে ভোগ করে, চায়, পালায়, ভয় পায়। সেখানে কোনো বাহ্যিক ইন্দ্রিয় সক্রিয় না থাকলেও সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতা চলতেই থাকে। স্মৃতি, কল্পনা ও আকাঙ্ক্ষা তখনও সক্রিয় থাকে এবং মন নিজেই সুখের ছবি আঁকে, দুঃখের দৃশ্য নির্মাণ করে।

এই অভিজ্ঞতাই স্পষ্ট করে দেয় প্রকৃত ভোগের কেন্দ্র ইন্দ্রিয় নয়, বরং মন ও চেতনার গভীর স্তর। ইন্দ্রিয় কেবল একটি মাধ্যম, একটি দরজা। সুখ বা দুঃখের অনুভব জন্ম নেয় সেই দরজার ভেতরে, চেতনার সঙ্গে মনের সম্পর্কের ভেতর।

কিন্তু এই সত্যটি না বোঝার ফলেই অধিকাংশ মানুষ সুখের অনুসন্ধান করে বাহ্যিক জগতে এবং মুক্তির পথ হিসেবে বেছে নেয় বাহ্যিক সংযম বা ত্যাগ। অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ প্রায়ই মনে করেন, ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার কমিয়ে দিলে বা ভোগ থেকে দূরে থাকলে স্থায়ী শান্তি আসবে।

তারা খাদ্য কমান, কথা কমান, নির্জনে বসে থাকেন, চোখ বন্ধ করে রাখেন। কেউ কেউ কঠোর ব্রত গ্রহণ করেন, শরীরকে কষ্ট দেন, সামাজিক জীবন থেকে সরে যান। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এসব সাধনা গভীর ও কঠিন বলে মনে হয় এবং সমাজের চোখে এঁরা অনেক সময় অত্যন্ত সাধক বা মহাপুরুষ বলে বিবেচিত হন।

কিন্তু আত্মানুসন্ধানের দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যায়, বাহ্যিক সংযম একা কখনোই স্থায়ী মুক্তি দিতে পারে না। দেহ ও ইন্দ্রিয়কে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা যায়, কিন্তু যদি নিজের মৌলিক প্রশ্ন ‘‘আমি কে?’’ এই প্রশ্নটির উত্তর অনুসন্ধান না করা হয়, তবে ভোগবাসনা মনের ভেতরে সূক্ষ্ম রূপে সক্রিয়ই থাকে।

বাইরে শান্ত দেখালেও ভেতরে ভেতরে লুকিয়ে থাকে আকাঙ্ক্ষার ও কামনার আগুন। এই আগুন কখনো দমে থাকে, কখনো ছাইয়ের নীচে লুকিয়ে থাকে, কিন্তু সুযোগ পেলেই আবার দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। তাই আত্মানুসন্ধান আমাদের শেখায় যে প্রকৃত বন্ধন ইন্দ্রিয়ের নয়, বরং ভ্রান্ত আত্মপরিচয়ের।

যখন মানুষ আত্মানুসন্ধানের পথে সত্যিকারের অগ্রসর হতে

শুরু করে, তখন তার দৃষ্টি ধীরে ধীরে বাহ্যিক জগৎ থেকে ভেতরের দিকে ফিরতে থাকে। সে আর শুধু ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতায় সন্তুষ্ট থাকে না। সে প্রশ্ন তোলে— আমি কি কেবল এই শরীর? এই চিন্তাগুলো কি সত্যিই 'আমি'? নাকি এর অন্তরালে আরও একটি চেতনাসত্তা আছে, যে সবকিছুকে জানে, দেখে ও প্রত্যক্ষ করে?

এই প্রশ্ন মানুষকে ধীরে ধীরে নিজের অভিজ্ঞতার পর্যবেক্ষক করে তোলে। এই অনুসন্ধান কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক তর্ক নয়; এটি এক গভীর আত্মসাক্ষাৎকার। এখানে মানুষ নিজের অভিজ্ঞতাকেই প্রশ্ন করতে শেখে।

সে দেখতে পায় শরীর পরিবর্তিত হয়, মন বদলে যায়, অনুভূতি আসে ও যায়। সুখ আসে, দুঃখ আসে, আবার মিলিয়ে যায়। কিন্তু এই পরিবর্তনের মাঝেও যে চেতনা সবকিছুকে প্রত্যক্ষ করছে, সে নিজে বদলায় না। এই অপরিবর্তনীয় প্রত্যক্ষকারীই ধীরে ধীরে মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করে।

এই উপলব্ধি থেকেই জ্ঞানযোগের প্রকৃত সূচনা। ক্রমে সাধক উপলব্ধি করে যে সে দেহ বা মন নয়, বরং সেই চেতনাসত্তা, যার উপস্থিতিতে দেহ ও মন অর্থ পায়। দেহ ও মন তখন আর 'আমি' নয়, বরং 'আমার' হয়ে ওঠে। এই সূক্ষ্ম পার্থক্যই জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

কারণ তখন সুখ আর বাইরের কিছু পাওয়ার উপর নির্ভর করে না। আনন্দ জন্ম নেয় নিজের অস্তিত্বের গভীর স্বীকৃতি থেকে। মানুষ অনুভব করে— আমি পূর্ণ, আমি অপর্যাপ্ত নই।

যখন এই জ্ঞান পরমপুরুষের প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতে রূপ নেয়, তখন সাধকের ভেতরে এক গভীর স্থির আনন্দ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আনন্দ কোনো বস্তুগত অর্জনের ফল নয়, কোনো সামাজিক স্বীকৃতির ফলও নয়। এটি কোনো ইন্দ্রিয়সুখ নয়, বরং নিজের চেতনাসত্তার স্বাভাবিক প্রকাশ।

এখানে ইন্দ্রিয়সুখ আর আকর্ষণীয় মনে হয় না, কিন্তু তা জোর করে ত্যাগ করা হয়নি। বরং জ্ঞানই স্বাভাবিকভাবে ভোগবাসনাকে অপ্রয়োজনীয় করে তোলে।

সহজভাবে বলা যায়, ভোগের আকাঙ্ক্ষা জোর করে দমন করলে তা আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কিন্তু নিজের সত্য স্বরূপ জানা গেলে সেই আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিটাই ভেঙে যায়। তখন চেতনা নিজেই পূর্ণতার সঙ্গে স্থির থাকে।

এই স্থিরতাই প্রকৃত বৈরাগ্য; যেখানে কিছু ছেড়ে দেওয়ার বেদনা নেই, আছে কেবল অন্তরের প্রাচুর্য।

অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ এই সূক্ষ্ম সত্যটি ধরতে পারেন না। তাঁরা মুক্তির সন্ধান করেন বাহ্যিক পথে; যেন অন্ধকার ঘরে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে আলো খোঁজার মতো।

তাঁরা বিশ্বাস করেন, প্রাণায়াম, আসন বা মুদ্রার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়কে জোরপূর্বক নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেই মুক্তি আসবে। চোখ বন্ধ করা, কান অচল করা, বাহ্যিক জগৎ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করাই তাদের সাধনার লক্ষ্য হয়ে ওঠে।

ইতিহাসে এর বহু উদাহরণ আছে। এমনকী সাপ ও ব্যাং তাদের সংস্কারবশত বহুদিন পর্যন্ত প্রাণায়াম দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলির কাজকে নিরুদ্ধ করে রাখতে পারে। অনেক অপরাধীও দীর্ঘদিন ধরে অসাধারণ সংযম প্রদর্শন করতে পেরেছে। তারা সমাজের চোখে বিস্ময় তৈরি করেছে। তাই বলে এরা কি মুক্তির শিখরে পৌঁছে গেছে?

কিন্তু বাস্তবতা তো ভিন্ন। তাদের চরিত্র বদলায়নি, তাদের ভোগবাসনার মূল প্রবণতা রয়ে গেছে অপরিবর্তিত। কারণ তারা চেতনায় কাজ করেনি; তারা কেবল বাহ্যইন্দ্রিয়কে দমন করেছে।

এই দমন করা বাসনাই পরে আরও প্রবল রূপে ফিরে আসে। ফলে পুনর্জন্ম, কর্মফল ও যন্ত্রণার চক্র অব্যাহত থাকে। বাহ্যিক সংযম মানুষের মনে সাময়িক শান্তি আনতে পারে, কিন্তু স্থায়ী তৃপ্তি দিতে পারে না; এটাই অজ্ঞানী ব্যক্তিগণের সাধনার মূল সীমাবদ্ধতা।

এর বিপরীতে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ অনুসরণ করেন। তারা ইন্দ্রিয়কে বন্ধ করতে চান না; তারা ইন্দ্রিয়কে অন্তর্মুখী করেন। দেহের অহংকার ও বিষয়ভোগের কেন্দ্র থেকে চেতনাকে সরিয়ে ভগবৎমুখী করেন।

ইন্দ্রিয় তখন আর ভোগের খোঁজে ছোটে না; তারা চেতনার গভীর আনন্দে অংশগ্রহণ করে। এই অবস্থায় বিষয়ের প্রতি আগ্রহ স্বাভাবিকভাবেই ক্ষীণ হয়ে যায়। কোনো জোর নেই, কোনো দমন নেই। মন ধীরে ধীরে এক গভীর, চিরন্তন তৃপ্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

জ্ঞানী ব্যক্তিগণ বৈরাগ্য, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ে চেতনার রূপান্তর ঘটান। বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণে যে শান্তি ক্ষণস্থায়ী, এই অভ্যন্তরীণ আনন্দ তার তুলনায় অনন্ত ও অবিনশ্বর।

প্রকৃত মুক্তি কোনো কৌশলে নয়, কোনো আচারেও নয়। এটি চেতনার রূপান্তরের ফল। আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম— সবই সহায়ক হতে পারে, কিন্তু লক্ষ্য হতে পারে না।

লক্ষ্য তখনই পূর্ণ হয়, যখন মন, ইন্দ্রিয় ও চেতনা একসঙ্গে ব্রহ্মানন্দের দিকে প্রবাহিত হয়। অজ্ঞানী ব্যক্তিগণের পথ মানুষকে কিছুক্ষণ বিস্মিত করে, সাময়িক আত্মশৃঙ্খলার অনুভূতি দেয়, কিন্তু শেষপর্যন্ত শূন্যতাই রেখে যায়।

জ্ঞানী ব্যক্তিগণের পথ মানুষের সামনে চিরন্তন মুক্তির দ্বার খুলে দেয়। এই পথ অন্তর্মুখী মনন, স্থির ভক্তি ও পরিপূর্ণ জ্ঞানের সমন্বয়ে নির্মিত।

যখন মানুষ এই পথ অবলম্বন করে, তখন তার জীবন হয়ে ওঠে আত্মার এক গভীর কাব্য। দেহ ও ইন্দ্রিয় আর শাসক থাকে না; চেতনাই নেতৃত্ব দেয়। প্রতিটি মুহূর্তে মানুষ অনুভব করে এক অমর আনন্দের নীরব কিন্তু প্রবল স্রোত। এভাবেই জ্ঞানী ব্যক্তিগণের সাধনা কেবল মুক্তি নয়;জীবনকেই রূপান্তরিত করে এক অনন্ত, দীপ্তিময় ও অমৃতময় অভিজ্ঞতায়। সেখানে কোনো আকুলতা নেই, কোনো দ্বন্দ্ব নেই; আছে শুধু শান্তি ও স্বচ্ছ বোধ। সেই আলোর মধ্যেই যাত্রা থামে না; বরং আরও গভীর কোনো সত্যের দিকে নীরবে এগিয়ে চলে। □

আর্থ-সামাজিকভাবে অনগ্রসর পরিস্থিতি সংরক্ষণের মাপকাঠি হলে শেষ হবে তুষ্টীকরণের রাজনীতি

সংরক্ষণের আওতাভুক্ত হয়ে উন্নতির সুযোগ দুর্বল নাগরিকদের দায়িত্ব বৃদ্ধি করে। কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রয়োগ দেশজুড়ে সমালোচনার ঝড় তুলবে।

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

ভারতে অন্তর্নিহিত রয়েছে এক অদ্ভুত স্ববিরোধিতা। বহু ক্ষেত্রে এ ভারত যেন নিজেই নিজের শত্রু। বহু শতাব্দী ধরে চলে আসছে এই ব্যবস্থা। সুপ্রাচীন কালে গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে 'বর্ণাশ্রম' ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় ভারতীয় সমাজে। দেশ, জাতি, সমাজ যখন জেহাদি ও বিদেশি শক্তির আক্রমণে পর্যুদস্ত ও পরাধীন হয়, তখন নানা বিকৃতি গ্রাস করে সমাজকে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে দেশকে লড়তে হয়েছে অসংখ্য লড়াই। স্বাধীনতা লাভের প্রায় ৭৫ বছর পর উদীয়মান অর্থনীতি হয়ে উঠেছে ভারত। ভবিষ্যতে বিশ্বগুরুর আসনে পুনরায় অধিষ্ঠিত হতে চলেছে আমাদের দেশ। কিন্তু সেই লক্ষ্যে পরিচালিত হতে হলে দেশকে জয় করতে হবে যাবতীয় মূঢ়তা ও অক্ষমতা।

বিভিন্ন রাজ্যে অজানা, অচেনা লোকজনকে দেখলে কারুর মনে প্রশ্ন আসে, কোন জাতের এই লোকটা? এর উত্তরে আপনা থেকেই মনে উদ্রেক হয় তার বংশভিত্তিক জাতের কথা। এটাই কিন্তু হলো সেই মূঢ়তা। ঠিকই, আমাদের সবারই একটা জাত রয়েছে। 'জাত' অর্থে জাতি নয়। 'জাত' অর্থ হলো স্বভাব, প্রবৃত্তি, প্রবণতা, স্বকীয়তা, নিজস্বতা, আত্মপরিচয়। কেউ জাত গায়ক, কেউ জাত রাঁধুনি, কেউ জাত শিল্পী, জাত পরিশ্রমী, কেউ-বা জাত কুঁড়ে। জাত ঝগড়ুটে যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে জাত দরদি। একাধিক প্রবণতা বা 'জাত'-এর মিশ্রণও অনেক মানুষের মধ্যে দেখা যায়। মানবজাতির রূপ ফুটে উঠুক মাতৃভাষায়। মানুষের কাজে। তাঁর সামাজিক আচরণে। 'জাত' মানে তো কোনো ব্যক্তির জন্ম কোন পরিবারে হলো এবং জন্মভিত্তিক বর্ণের শ্রেণীবিন্যাসে তিনি ঠিক কোথায় অবস্থান করছেন তা নয়। গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে বর্ণাশ্রমের শ্রেণীবিন্যাসের পরিবর্তে জন্মভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস ছিল একটা সময় মানুষের সঙ্গে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করার এবং সমগ্র সমাজে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর একাধিপত্য বিস্তারের অপকৌশল। জাতপাতের অসংখ্য বিভাজন এবং এই পদবি হলে তিনি উচ্চ জাতের, ওই পদবি হলে তিনি নিম্নবর্ণের— এরকম বিকৃতি সময়ের সঙ্গে গ্রাস করে ভারতীয় সমাজের এক বড়ো অংশকে। এই প্রক্রিয়ায় দাগিয়ে দেওয়া প্রান্তিক, আর্থ-সামাজিকভাবে অনগ্রসর, শোষিত, বঞ্চিত সব মানুষ সমানাধিকার পাক— স্বাধীনতা লাভের পর এটাই হয়ে উঠল ভারতের মূলমন্ত্র। স্বাধীন ভারতে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহ প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন কার্যকর হলো মণ্ডল কমিশনের বিভিন্ন সুপারিশ। ভারতীয় সংবিধান-প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে অনগ্রসর জাতিগোষ্ঠী চিহ্নিতকরণের কাজ শুরু করল সবক'টি রাজ্য। এটা একটা বিরাট প্রক্রিয়া যা সময়সাপেক্ষ তো বটেই। বহুমাত্রিক এই দেশে পিছিয়ে পড়া, অনগ্রসর জাতিগোষ্ঠী চিহ্নিত করা, অস্পৃশ্যতার বেড়া ভেঙে অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে তাঁদের সংরক্ষণের আওতায় আনা, শিক্ষার আলোকে তাঁদের আলোকিত করা, সরকারি শিক্ষা, সরকারি চাকরি থেকে কেন্দ্র ও রাজ্যের আইনসভায় জনপ্রতিনিধিত্বের আসন সংরক্ষণের মতো কাজ দেশজুড়ে চলেছে দীর্ঘদিন ধরে।

সামাজিক বিকৃতির অভিশাপ ও জড়তা থেকে ধীরে ধীরে মুক্তি পেতে চলেছে গোটা দেশ। সরকারি কাজ থেকে আইনসভা— সর্বত্র তাঁদের আওয়াজ থাকুক, তাঁদের ভালো-মন্দ জানানোর কণ্ঠ থাকুক, এটাই ছিল স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে ভারতীয় চেতনা, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ। অনগ্রসর জাতি, তপশিলি জাতি, উপজাতি, জনজাতিগোষ্ঠী তাঁদের মেধা, শ্রম, লড়াইয়ের মাধ্যমে অদম্য জেদ ধরে রেখে হয়ে উঠল সপ্রতিভ। অচলায়তনের বেড়া গেল ভেঙে। আজ বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে উঠেছে ভারত। উন্নত দেশ নির্মাণের প্রতিটি সংকল্প পূরণের পথে অগ্রসর হচ্ছে আজকের ভারত। স্বাধীনতার পর দেশের সংবিধান প্রণয়নের সময় জাতিগত বৈষম্যের প্রথা শেষ করতে প্রণীত হয় জাতিগত সংরক্ষণ ব্যবস্থা। ১৯৭৯ সালে কেন্দ্রে জনতা পার্টির সরকার ক্ষমতাসীন থাকাকালীন বিপি মণ্ডলের নেতৃত্বে গঠিত হয় মণ্ডল কমিশন। ১৯৯০ সালে সেই কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহ। পরে দেশে এই জাতিগত সংরক্ষণের বিষয়ে দায়ের হওয়া বিভিন্ন মামলায় তাদের দেওয়া রায়ে সংরক্ষণের আওতা থেকে 'ক্রিমি লেয়ার' বাদ দেওয়ার কথা বলে সুপ্রিম কোর্ট।

বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহ যখন মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করেছিলেন,

সেই সময় ভারতীয় সমাজের পিছিয়ে থাকা, অনগ্রসর শ্রেণীর আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি আর আজকের পরিস্থিতি কিন্তু এক নয়। 'আনপ্রিভিলেজড্' অবস্থা থেকে বের করে সমাজের একটা বড়ো অংশকে গত ৭৫ বছর ধরে 'প্রিভিলেজড্' শ্রেণীতে পরিণত করেছে দেশ। তাঁদের দেওয়া 'প্রিভিলেজ' (অর্থাৎ বিশেষ সুযোগসুবিধা) যেন 'আনডিউ প্রিভিলেজ'-এ পরিণত না হয় সেই মর্মেই সাম্প্রতিক কালে সুপ্রিম কোর্টে যাবতীয় মামলার অবতারণা। অনগ্রসর শ্রেণীর সংরক্ষণের ক্ষেত্রে জাতিগত ভিত্তির ওপর যাবতীয় গুরুত্ব আরোপ করেছে ভারতীয় সংবিধান। প্রণীত হয়েছে ওবিসি (আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস) সংরক্ষণ। সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশজুড়ে এই সংরক্ষণ প্রথায় প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংস্কারের দাবি উঠেছে। ওবিসি-র পরিবর্তে 'ফিনান্সিয়ালি ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস' বা আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীকে সংরক্ষণ ব্যবস্থার আওতায় আনা উচিত বলে মতপ্রকাশ করছেন অনেকেই। জাতির পরিবর্তে আর্থিক অবস্থাই সংরক্ষণের মানদণ্ড হওয়া উচিত বলে তাদের মত। তাদের প্রশ্ন হলো কেবলমাত্র জাতির ভিত্তিতে শিক্ষা ও চাকরিতে সংরক্ষণ ঠিক কতটা যুক্তিযুক্ত? স্বাধীনতা লাভের ৭৫ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এই প্রশ্নটি দেশজুড়ে উঠে আসছে জোরালো ভাবে। ধরা যাক, সমাজের প্রান্তিক স্তর থেকে উঠে আসা, অনগ্রসর জাতিভুক্ত ব্যক্তিদের কয়েকজন অনেক প্রতিকূলতা টপকে হয়তো ডাক্তার, অধ্যাপক বা আইনজীবী হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলেন। যখন তিনি সংরক্ষণ ব্যবস্থার সুবিধা পেয়েছিলেন, তখন তিনি সংরক্ষণের যুক্তিসঙ্গত দাবিদার ছিলেন। আজ সেই প্রতিষ্ঠিত উকিল, চিকিৎসক, অধ্যাপক বা আর্থ-সামাজিক স্তরে যে কোনো সুপ্রতিষ্ঠিত অনগ্রসর জাতিগোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তির পরবর্তী প্রজন্মও কি সবকিছুতেই সংরক্ষণের দাবিদার হবে? জাতিগতভাবে এই সংরক্ষণ কি কোনো মৌলিক অধিকার? এটা ঠিক যে, সমাজের একটা বড়ো অংশের কাছে সংরক্ষণের সুবিধা বর্তমানে জন্মগত অধিকার। কিন্তু জন্মগত পরিচয়ের ভিত্তিতে এই সংরক্ষণ বৈষম্য আনবে না তো? ভারতীয় সমাজে বিভাজন সৃষ্টির মাধ্যমে ভোটব্যাংকের রাজনীতি করা রাজনৈতিক দলগুলি দাবি করে যে, জাতিগত শ্রেণীবিভাজনের ভিত্তিতে সংরক্ষণই হলো অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষের জন্মগত অধিকার। আবার এর সম্পূর্ণ বিপ্রতীপে তারাই স্লোগান তোলে যে, মানুষে মানুষে কোনো ভেদ নেই। তাদের এই বিকৃত মতাদর্শ সত্যিই যেন এক সোনার পাথরবাটি। ভোটভিখারিদের দ্বিচারিতার বিষয়গুলি আজ জনমানসে রীতিমতো প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। বাবাসাহেব ড. ভীমরাও আম্বেদকর বলেছিলেন, 'Caste is not a division of labour, it is division of labourers'। যে সময়ের পটভূমিতে তিনি এই উক্তি করেছিলেন, তা ছিল মানুষের সঙ্গে মানুষের বৈষম্য তৈরির কালিমাসিক্ত সময়। দেশের বুকে তপশিলি জাতি, উপজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত জাতিগুলি যাতে সম্মানের সঙ্গে জীবনযাপন করতে পারে, তার পর্যাপ্ত সুযোগ রেখেছে ভারতীয় সংবিধান। সংবিধানের ১৫(৪), ১৫(৫), ১৬(৪), ১৭ ও ৪৬ নং অনুচ্ছেদে অনগ্রসর জাতিগুলির প্রাপ্য সুযোগসুবিধার বিষয়গুলি বর্ণিত হয়েছে। জাতি ও বর্ণবৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থার বিষয়ে আম্বেদকর বলেছিলেন, 'গ্রেডেড ইনইক্যুয়ালিটি'। তারপর সংরক্ষণের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ধীরে ধীরে সেই 'গ্রেডেড ইনইক্যুয়ালিটি'র করালগ্রাস থেকে বেরিয়ে এলো দেশ। কিন্তু সময় পরিবর্তনের সঙ্গে প্রত্যেকটি নিয়মই স্বাভাবিকভাবে বদলায়। সময়ের সঙ্গে নিয়ম কানুনের মধ্যে ঘটে যায় সংযোজন, বিয়োজন যা এক অতি সাধারণ প্রক্রিয়া। আজকেও যদি নিম্নবর্ণের বলে দাগিয়ে দিয়ে কোনো ব্যক্তিকে কেউ তাচ্ছিল্য করে, তবে তাতে ধিক্কার জানায় গোটা দেশ।

আবার যখন দেখা যায় যে, আর্থ-সামাজিকভাবে সচ্ছল এবং তথাকথিতভাবে অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত পরিবারের কোনো ছাত্র কোনো বিষয়ের পরীক্ষায় ৫৫ পেয়ে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলো, কিন্তু আর্থিকভাবে অসচ্ছল জেনারেল কাস্ট বা তথাকথিত উচ্চবর্ণ পরিবারের ছাত্র একই পরীক্ষায় ৭০ পেয়েও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারল না বা চাকরির পাওয়ার ক্ষেত্রে 'যোগ্য'দের তালিকাভুক্ত হতে পারল না, তখনও দেশের মধ্যে জমা হতে থাকে চাপা ক্ষোভ। 'কোয়ালিটি'কে 'কোয়ান্টিটি'র পায়ের নীচে ফেলে পিষে দেওয়ার এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনমানসে ঘনীভূত হয় তীব্র অসন্তোষ। ভারতীয় সংবিধানের ১৪ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে 'ইক্যুয়ালিটি অফ দ্য ইক্যুয়ালস্'-এর সাংবিধানিক নীতি। আজ আর সেই দিন নেই যে, কেউ পদবির কারণে কেউ 'অনগ্রসর' বলে গণ্য হবে বা তথাকথিত অনগ্রসর জাতের হওয়ার কারণে কেউ স্কুলে আসতে পারবে না। তথাকথিত অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত হওয়ার কারণে কেউ সরকারি বা সামাজিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হবে। কিন্তু আজ সেই দিন উপস্থিত যখন জাতপাত-বর্ণ নির্বিশেষে আর্থ-সামাজিকভাবে যারা দুর্বল, তাদের সমানাধিকার দিতে হবে। সবরকম সচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও পদবি ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সংরক্ষণের সুবিধা অব্যাহত থাকার বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণেও একাধিকবার এসেছে। বিভিন্ন উন্নত দেশেও সমাজের অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা বিদ্যমান। আর্থিকভাবে অসচ্ছল শ্রেণীর মানুষই কিন্তু সেই সংরক্ষণ পাওয়ার যোগ্য। ভারতে জাতিগত ভিত্তিতে সংরক্ষণ প্রথাকে টিকিয়ে রাখা হচ্ছে। রাজনৈতিক স্বার্থেই ভারতে টিকে রয়েছে এই ব্যবস্থা। অনেক ক্ষেত্রেই ভোটব্যাংক ধরে রাখতে ব্যবহৃত হচ্ছে এই অযৌক্তিক, অপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর উন্নয়নের জন্য যদি সংরক্ষণ প্রয়োজন হয়, তবে এখন তা দ্ব্যর্থহীনভাবে সমর্থন করবে গোটা দেশ। সেকুলার, ভোটভিখারি, জাতপাতভিত্তিক রাজনীতির কারবারিদের কারসাজিতে বিরক্ত দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। মেধা বনাম সংরক্ষণ, শ্রম বনাম সংরক্ষণ, গুণগত মান বনাম সংরক্ষণ— এই দ্বন্দ্বগুলি আজ নানাভাবে হয়ে উঠেছে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। যুবসমাজের মনে জমে রয়েছে চাপা অসন্তোষ। বুদ্ধি ও পরিশ্রমের জোরে পরীক্ষায় কোনো ছাত্র ৮০ শতাংশ নম্বর পেয়েও যখন সংরক্ষিত শ্রেণীভুক্ত পদবির

অধিকারী না হওয়ার কারণে যখন সরকারি চাকরি থেকে সে বঞ্চিত হয়, তখন তার মনের ক্ষোভ যেন পরিণত হয়ে রোষে।

এসবের বিপ্রতীপে ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন (ইসরো), ভারতীয় সেনাবাহিনী, ভারতের জাতীয় ক্রিকেট দল ইত্যাদির ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো জাতিগত সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু নেই। সংরক্ষণের সুবিধায় বিজ্ঞানী পদ প্রাপ্তির বিপ্রতীপে ইসরোতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের ক্ষেত্রে মেধা, শ্রম, কর্তব্যই হলো একমাত্র মাপকাঠি। তাহলে সরকারি ক্ষেত্রে অন্যান্য চাকরির ক্ষেত্রে কেন অব্যাহত থাকবে এই অসাম্য? ডাক্তারি, শিক্ষকতা বা অন্যান্য দায়িত্বপূর্ণ জীবিকা অধিকারের ক্ষেত্রে একজন তথাকথিত অনগ্রসর শ্রেণীর সচ্ছল ব্যক্তি কম স্কোর করেও সুযোগ পাবেন, কিন্তু তাঁর থেকে বেশি স্কোর করেও জেনারেল কাস্ট বা অসংরক্ষিত শ্রেণীভুক্ত একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি তা পাবেন না। এই প্রক্রিয়ায় কর্ম ও পরিষেবা দানের গুণগত মানের ক্ষেত্রে হয়তো একটু বেশিই বোঝাপড়া হয়ে যাচ্ছে।

আর্থ-সামাজিক দিক থেকে অনগ্রসর মানুষের সংরক্ষণের কথা উঠলেই মেকি গরিব-দরদি, ভণ্ড, দেশদ্রোহী কমিউনিস্টদের দল প্রতিবাদীদের 'ব্রাহ্মণ্যবাদী', 'দলিত-বিরোধী' ইত্যাদি বলে দাগিয়ে দেয়। জাতিগত বিভাজনকামী এই বিষাক্ত শক্তি চেপে দিতে চায় একটি অনির্বচনীয় সত্য। সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ততক্ষণ, যতক্ষণ সেই অনগ্রসর শ্রেণীর আর্থ-সামাজিক-ভিত্তিক সবরকম সুরক্ষা প্রয়োজন। সংরক্ষণের সুফল লাভের মাধ্যমে যে মুহূর্তে একটি বা একাধিক প্রজন্ম আর্থ-সামাজিকভাবে উন্নত হলো, তখন জন্মসূত্রে পরবর্তী প্রজন্মের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ প্রাপ্তির বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। কিন্তু এই পদ্ধতি অব্যাহত থাকলে বঞ্চিত হতে থাকে অসংখ্য যোগ্য। 'দ্য মহারাষ্ট্র স্টেট রিজার্ভেশন ফর সোশ্যালি অ্যান্ড এডুকেশনালি ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস অ্যাক্ট, ২০১৮' পাশের মাধ্যমে মহারাষ্ট্র সরকার মরাঠা জনগোষ্ঠীকে সরকারি চাকরি ও

ভারতীয় সংবিধানের ১৬ (৪) ও ১৬ (৪ক) নং অনুচ্ছেদ নিশ্চিতভাবে সকল অনগ্রসর শ্রেণীকে সম্মান প্রদর্শন-সহ সংরক্ষণ এবং সরকারি চাকরিতে সমান সুযোগ দেওয়ার কথা বলেছে। কোথাও গুণগত মানের সঙ্গে আপোশ করতে বলেনি কিন্তু সংবিধান। বৃহত্তর অর্থে 'অনগ্রসর শ্রেণী'র আওতায় আর্থ-সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসও পড়ছে। সে বিষয়ে দেশের সজাগ হওয়ার সময় এসেছে।

শিক্ষায় সংরক্ষণের সুবিধাধীন করতে উদ্যোগী হলে সেই আইনটি খারিজ করে সুপ্রিম কোর্ট। আদালত মনে করিয়ে দেয় যে, সংরক্ষণের উদ্দেশ্য সমাজের প্রান্তিক স্তরের মানুষকে সরকারি সুবিধার আওতায় আনা। সুবিধালাভের মাধ্যমে উন্নতিপ্রাপ্তির পরও কি সে বা তারা তাদের জন্য সংরক্ষণ অব্যাহত রাখার দাবি করবে? এক্ষেত্রে তপশিলি জাতি, উপজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণীর কোন পরিবারগুলি ইতিমধ্যেই সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং আর্থ-সামাজিকভাবে সবল, সেই বিষয়টি একটি সমীক্ষার মাধ্যমে চিহ্নিত করা যায় বলে জানায় শীর্ষ আদালত। একই সঙ্গে জাতিগত পরিচয় নির্বিশেষে কোন পরিবারগুলি আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে রয়েছে— সমীক্ষার মাধ্যমে তাদের তথ্য সংগ্রহ করে তাদের সংরক্ষণের আওতায় আনা যায় বলেও মতপ্রকাশ করে আদালত।

অনেক শিক্ষাবিদ মতপ্রকাশ করেছেন যে, বিদ্যালয় শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সংরক্ষণ থাকা উচিত। কিন্তু শিক্ষা গ্রহণের পূর্ণ সুযোগ প্রাপ্তির পর মেধা পরীক্ষা বা পাবলিক এক্সামিনেশনের ক্ষেত্রে তারা তো সকলেই সমকক্ষ। তাই শিক্ষান্তে সরকারি চাকরি বা গবেষণায় সুযোগলাভের জন্য মেধার ভিত্তিতে যে পরীক্ষা হয়, সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সংরক্ষণ কার্যকর হওয়া উচিত নয়। তখনও সংরক্ষণ মানে উন্নতমানের গবেষণা বা নাগরিক পরিষেবা দানের ক্ষেত্রে আপোশ করছে দেশ। ২০০৬ সালে নাগরাজ মামলায় [Nagraj case (2006)8 SCC2/2 AIR SC 71] আরও একটি উল্লেখযোগ্য রায় দেয় শীর্ষ আদালত। সেই রায়ে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে যে, সংরক্ষণের আওতায় থেকে সরকারি চাকরি লাভ করলেও, সরকারি পদে প্রোমোশন বা পদোন্নতির ক্ষেত্রে কোনোভাবেই প্রযুক্ত হবে না 'সংরক্ষণ'। সংরক্ষণের বলে সরকারি ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক হতে পারে না পদোন্নতি। সুপ্রিম কোর্ট তাদের দেওয়া রায়ে বলে, 'The Article 16(4) of the Constitution does not give the State any authority to grant reservation for promotion...'। আদালতের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা থেকে এটা স্পষ্ট যে, 'সংরক্ষণ' কিন্তু বাড়তি কোনো কিছু পাইয়ে দেওয়ার পন্থা নয়। যিনি বঞ্চিত তাঁর হাত ধরার কাজ করবে সংরক্ষণ। একাধিক ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, যে মুহূর্তে একজন বঞ্চিত সংরক্ষণের দ্বারা উপকৃত হয়ে নিজের পায়ে চলতে সক্ষম হবেন, সেই সময় থেকেই তাঁর 'সংরক্ষণ' নামক বাড়তি অবলম্বন অপ্রাসঙ্গিক।

'দ্য পাবলিক সার্ভেন্টস্ (রিজার্ভেশন অফ সিট্স্ ফর এসসি, এসটি অ্যান্ড ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস) অ্যাক্ট, ১৯৯৪ (উত্তরপ্রদেশ)' আইনটি শীর্ষ আদালতে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলে ২০১২ সালের ২৭ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্ট জানায় যে এভাবে প্রোমোশন অসাংবিধানিক। তাদের দেওয়া রায়ে সুপ্রিম কোর্ট বলে, 'Reservation in promotion cannot be granted as a Fundamental privilege.'। সংরক্ষণ

কতটা দরকার, কতদূর পর্যন্ত দরকার, সংরক্ষণের প্রয়োগসীমা যে সীমাবদ্ধ, প্রয়োগের প্রেক্ষিত ও প্রাসঙ্গিকতাও যে পরিবর্তিত হতে পারে, অথবা রাজ্যের দ্বারা প্রণীত এই সংক্রান্ত আইনও চ্যালেঞ্জ হতে পারে— সেই বিষয়গুলি এই গুরুত্বপূর্ণ রায়ে উঠে আসে। 'সংরক্ষণ'কে ভাঙিয়ে যারা রাজনৈতিক ফয়দা তুলতে ব্যস্ত, তারা কোনোদিনই ভাবেননি যে শিক্ষা ও কাজের ক্ষেত্রে মেধার গুণগত মানের সঙ্গে আপোশ করার পরিণতি কী হতে পারে। আর্থ-সামাজিক প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা ছাড়াই যে রাজনৈতিক দলগুলি আজকেও অন্ধভাবে জাতিভিত্তিক সংরক্ষণ চাইছে, সেই সব বধিররা অসংখ্য যোগ্যদের আর্তনাদ শুনতে অক্ষম। সরকারি উদ্যোগের বাইরে গিয়ে একজন তপশিলি উপজাতি জনপ্রতিনিধি তাঁর লোকসভা বা বিধানসভা কেন্দ্রে চিহ্নিত করুন যে, তাঁর কেন্দ্রের কতগুলি উপজাতি পরিবার আজ আর্থ-সামাজিকভাবে সবল। সেই চিহ্নিত পরিবারের এই প্রজন্ম তো শক্তিশালী ভারতের নাগরিক। তবে তাঁরা কেন নিজেদের সংরক্ষণের আওতায় রেখে জোর করে নিজেদের বঞ্চিত, দুর্বল বলবেন?

১৯৭৮ সালে 'অল অসম ট্রাইবাল স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন' একটি অভূতপূর্ব পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তারা দাবি করে যে, ট্রাইবাল কোটা বন্ধ হোক। জাতিভিত্তিক কোটা বন্ধ হোক। সরকার আর্থ-সামাজিক ভিত্তিতে দুর্বলদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করুক। রাজনীতির পরিবর্তে সমাজ চেতনার প্রতিফলন ঘটে আটসুর এই আন্দোলনে। এর বিপ্রতীপে সংরক্ষণের নামে অগণিত রাজনৈতিক তরজা, ধরনা, টানাপোড়েন হয়েছে ভারত জুড়ে। পিছনে ভোট রাজনীতির জটিল অঙ্ক থাকার কারণে 'সংরক্ষণ'-এর উদ্দেশ্যটাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়; সংরক্ষিত আসনেরও অপচয়, অপব্যবহার হয়। ভারতের শীর্ষ আদালত এখনও পর্যন্ত বেশ কয়েকটি ল্যান্ডমার্ক রায় ঘোষণা করেছে যাতে প্রমাণিত হয় যে, সংরক্ষণ কোনো মৌলিক অধিকার নয়। ডিএমকে বনাম কেন্দ্রীয় সরকার (Dravida Munnetra Kazhagam Vs. Union of India and Ors.) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট কড়া ভাষায় বলে যে, সংরক্ষণ কোনো যুক্তিতেই মৌলিক অধিকার নয়। রাজনৈতিক দল ডিএমকে চাইছিল— অন্যান্য অনগ্রসর গোষ্ঠীর জন্য তামিলনাড়ুতে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও ডেন্টাল কলেজে ৫০ শতাংশ আসন সংরক্ষণ। আদালতের যুক্তিযুদ্ধে সেই প্রচেষ্টা ধোপে টেকেনি। 'Mukesh Kumar Vs. The State of Uttarakhand' মামলায় যখন ভারতীয় সংবিধানের ১৬(৪) ও ১৬(৪ক) অনুচ্ছেদের জোরে বাড়তি সংরক্ষণের সুবিধা দাবি করা হয় তখনও সুপ্রিম কোর্টের ছিল একই বক্তব্য— 'অ্যাপয়েন্টমেন্টস্ অ্যান্ড প্রোমোশন্স ইন পাবলিক সার্ভিসেস'-এ সংরক্ষণ কখনোই মৌলিক অধিকার নয়।

ভারতীয় সংবিধানের ১৬(৪) নং অনুচ্ছেদটি ১৬ নং অনুচ্ছেদ বা ধারাটির প্রবর্ধক (এক্সটেনশন) মাত্র। যার ফলে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় জাতিগত সংরক্ষণের ভিত্তিতে পদোন্নতি বা অন্যান্য সুবিধালাভের বিষয়ে বারবার তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে যে, প্রশাসনিক দক্ষতা বজায় রাখতে সংরক্ষণের আওতায় তাকে আনতে চায়নি কেন্দ্র বা রাজ্যে আসীন বিভিন্ন সরকার। প্রশাসনিক দক্ষতার গুরুত্ব, তার গুণমান, ধারভার নিয়ে কোনো আপোশ করা হয়নি। পরিতাপের বিষয় হলো মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং, ব্যাংক পরিষেবা, শিক্ষকতা, গবেষণা-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে পদবির জোরে মিলে যায় নানা সরকারি পদ। কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুধুমাত্র পদবির জোরে শিক্ষকের আসন অধিকার করা কি ন্যায়সঙ্গত? আর্থ-সামাজিকভাবে যথেষ্ট সবল হওয়া সত্ত্বেও পদবির জোরে জাতিভিত্তিক সংরক্ষণের সুবিধা গ্রহণ দেশজুড়ে চলছে। ভারতীয় সংবিধানের ১৬ (৪) ও ১৬ (৪ক) নং অনুচ্ছেদ নিশ্চিতভাবে সকল অনগ্রসর শ্রেণীকে সম্মান প্রদর্শন-সহ সংরক্ষণ এবং সরকারি চাকরিতে সমান সুযোগ দেওয়ার কথা বলেছে। কোথাও গুণগত মানের সঙ্গে আপোশ করতে বলেনি কিন্তু সংবিধান। বৃহত্তর অর্থে 'অনগ্রসর শ্রেণী'র আওতায় আর্থ-সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসও পড়ছে। সে বিষয়ে দেশের সজাগ হওয়ার সময় এসেছে। বাবাসাহেব ড. আম্বেদকর তাঁর রচিত 'দ্য অ্যানাইহিলেশন অফ কাস্ট' গ্রন্থে বলেছেন যে, সামাজিক সংস্কার প্রয়োজন অর্থনৈতিক সংস্কার আনার জন্য।' আজ যে অর্থনৈতিক সংস্কারের পথে অগ্রসর হয়েছে ভারত, তা মেনে নিয়েছে সমগ্র বিশ্ব। অতএব এটা প্রমাণিত যে ভারতের প্রয়োজনীয় সামাজিক সংস্কার হয়েছে। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের সঙ্গে নাগরিকদের ভাবনাচিন্তার পরিবর্তন এবং বিভিন্ন সুযোগসুবিধা নেওয়ার অভ্যাসেরও সংস্কারটা আজ খুবই প্রয়োজন। কোনো লুপ্তপ্রায় জনজাতির মানুষ বা সংকটাপন্ন বন্যপ্রাণ বা উদ্ভিদ তো নয় এই কোটি কোটি নাগরিক যে তার 'সংরক্ষণ' দশকের পর দশক ধরে অব্যাহত থাকবে। সংরক্ষণ না পেলেই সে বা তারা বিলুপ্ত হবেএমনটাও তো নয়। আর্থ-সামাজিকভাবে স্বাবলম্বী বা আত্মপ্রত্যয়ী না হয়ে ওঠা পর্যন্ত আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া, দুর্বল নাগরিকদের জন্য সংরক্ষণ অবশ্যই প্রয়োজন। তাই দেশজুড়ে আর্থ-সামাজিক দুর্বলতার ভিত্তিতে, জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে বিদ্যালয় শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার সব স্তরে সংরক্ষণ চালু হোক। শিক্ষার সুযোগে সংরক্ষণটাই প্রকৃত সামাজিক সাম্য আনে। সরকারি চাকরি, সরকারি কাজ বা সেই ক্ষেত্রে পদোন্নতি হোক শুধুমাত্র মেধা ও শ্রমের ভিত্তিতে। যেটা ভারতীয় সেনা ও ইসরো করছে, সেটা কেন সারা দেশের সব সরকারি কর্মক্ষেত্রে থাকবে না? সরকারি কাজে মেধা ও শ্রম গুরুত্ব পেলে, ফিরে আসবে কর্মসংস্কৃতি। সরকারি কাজের প্রণালীর যেন এতটাও রাজনীতিকরণ না হয়, যাতে তার গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রশাসনিক নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাই প্রয়োজন ভারতীয় সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদের সঠিক, ভারসাম্যযুক্ত প্রয়োগ। সংরক্ষণের আওতাভুক্ত হয়ে উন্নতির সুযোগ দুর্বল নাগরিকদের দায়িত্ব বৃদ্ধি করে। কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রয়োগটাও কিন্তু দেশজুড়ে সমালোচনার ঝড় তুলবে। □

ভারত সীমান্তে জামাতের উত্থানে পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের নিরাপত্তা বিপন্ন হতে পারে

মোহিত রায়

গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বাংলাদেশে বহু প্রতীক্ষিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়ে গেল। এর দেড় বছর আগে একটি নির্বাচিত সরকারকে জেহাদি অভ্যুত্থান করে উৎখাত করা হয়েছিল। প্রচুর হিংসা, হত্যা, সংখ্যালঘু হিন্দু নির্যাতন এবং সবশেষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিতাড়ন, সব মিলিয়ে যাকে বলা হচ্ছে 'জুলাই বিপ্লব'। এই জুলাই বিপ্লবের মূল কথাই ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সম্পূর্ণ বিরোধিতা। এ সময়ে বাংলাদেশের প্রিয় স্লোগান হয়ে উঠেছিল, 'তুমি কে, আমি কে, রাজাকার, রাজাকার।' এই ইসলামি জেহাদি অভ্যুত্থান হয়েছিল একেবারে পূর্ব-পরিকল্পিত। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলির কাছে এ বিষয়ে খোঁজখবর থাকলেও বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সরাসরি হস্তক্ষেপ করেনি ভারত। এই ঘটনার আগে বহু বছর ধরে বাংলাদেশ জুড়ে আমেরিকা, চীন ও পাকিস্তানের কার্যকলাপ এবং জেহাদি তোষণের ব্যাপারে হাসিনা সরকারকে বারবার ভারত সরকারের পক্ষ থেকে সতর্ক করা হয় বলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ। কিন্তু প্রশাসনিক নীতি সংশোধন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হন শেখ হাসিনা। আওয়ামি লিগের অপশাসন বা স্বৈরাচারী শাসনের হিংসাত্মক বিরোধিতা হতেই পারে কিন্তু সে কারণে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক, মূর্তি ধ্বংস, শেখ মুজিবুরের স্মারক ধ্বংস, রাজাকারদের জয়ধ্বনির কোনো প্রয়োজন ছিল না। ২০২৪ সালের জেহাদি অভ্যুত্থানের পর ২৬ সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্কের ক্লিনটন গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভের বার্ষিক সম্মেলনের ভাষণে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা শান্তির নোবেল বিজয়ী মহম্মদ ইউনুস কোনো বিভ্রান্তি না রেখে জানিয়েছিলেন যে বাংলাদেশের এই 'বিপ্লব' ছিল সুচিন্তিত ও পূর্ব-পরিকল্পিত। এই পূর্ব-পরিকল্পনার প্রধান মস্তিষ্ক মাফুজ আবদুল্লাকে মঞ্চে নিয়ে পরিচয়ও করিয়ে দেন। মাফুজ আবদুল্লা একজন পরিচিত ইসলামি জেহাদি সংগঠক।

মুক্তিযুদ্ধের অপমান কিন্তু ভারতের অপমান। যে চার হাজার ভারতীয় সেনা একটি প্রতিবেশী দেশকে স্বাধীন করতে প্রাণ দিয়েছে তাঁদের অপমান। কিন্তু ভারত সরকারকে এসবের জন্য আদৌ বিচলিত হতে দেখা যায়নি। হিন্দুরা যখন গলাজলে নদীর বুকে দাঁড়িয়ে ভারতে আশ্রয় চেয়েছে, ভারতের সীমান্ত রক্ষীবাহিনী তাঁদের ফিরিয়ে দিয়েছে। এরকম পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে বছর দেড়েক বাদে নির্বাচন হলো। নির্বাচন হলো আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। আওয়ামি লিগের অনুপস্থিতিতে বিএনপি (বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি) বাংলাদেশের নির্বাচনে ২০৯ আসনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করেছে। জামায়াতে ইসলামি ৬৮টি আসন জিতে একমাত্র প্রধান বিরোধী দল হয়েছে ।

অনেকেই সান্ত্বনা দিচ্ছেন জামাত তো জেতেনি। জামাত মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে, পাকিস্তানের পক্ষে। সেখানে বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। স্বাধীনতার ঘোষক। জিয়াউর রহমানের উত্থানের সঙ্গে কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্রের কোনো যোগ নেই। সামরিক গোষ্ঠীর রক্তাক্ত আন্তঃসংঘর্ষের মধ্য দিয়ে জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের সেনাপ্রধান হন এবং পরে ১৯৭৮এ দেশের রাষ্ট্রপতি হয়েই বাংলাদেশের সংবিধানে ইসলামীকরণ শুরু করেন। সংবিধানের প্রস্তাবনায় যুক্ত হয় 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম', মৌলিক নীতিতে জুড়ে দেওয়া হলো 'সর্বশক্তিমান আল্লার উপর পরম বিশ্বাস ও আস্থা'। বাদ দেওয়া হলো ধর্মনিরপেক্ষতা। যে মুসলিম লিগের নেতা আজিজুর রহমান শাহ ১৯৭১এ রাষ্ট্রসঙ্ঘে পাকিস্তানের প্রতিনিধি হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছিলেন, জিয়াউর রহমান ১৯৭৯ সালে সেই আজিজুর রহমানকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন। ১৯৮১ সালে এক সামরিক গোষ্ঠীর আক্রমণে জিয়ার মৃত্যু হয়। এরপর বিএনপি সব নির্বাচনেই জোট বেঁধেছে জামাতের সঙ্গেই, কোনোরকম ধর্মনিরপেক্ষতার আব্রু রাখার চেষ্টা করেনি।

জামাতের সঙ্গে জোট করে বিএনপি শেষবার ক্ষমতায় এসেছিল ২০০১ সালের অক্টোবরে। চরম ভারত বিরোধী এই সরকারের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষার যথাসম্ভব চেষ্টা করে নয়াদিল্লি। তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী বেগম খালেদা জিয়াকে অভিনন্দন জানান এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ব্রজেশ মিশ্রকে পাঠান তাঁর অভিনন্দন ব্যক্তিগতভাবে প্রদানের জন্য। ব্রজেশ মিশ্র ছিলেন নির্বাচনের পর ঢাকায় পা রাখা প্রথম বিদেশি কূটনীতিবিদ। বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু সমাজ বিএনপি'র প্রত্যাবর্তনে ভীত ছিল এবং কিছুদিনের মধ্যেই তাঁদের ওপর শুরু হয়ে গেল জেহাদি আক্রমণ। এক মাসের মধ্যেই শুরু হলো হিন্দুদের বিতাড়ন। উদ্বাস্তুর ঢল নামল সীমান্তে।

ওই সময়ে বরিশালের ভোলা জেলায় চর ফ্যাশনে তিনদিন ধরে কয়েকশ হিন্দু নারীকে যৌন নির্যাতন করা হয়। বিএনপি শাসনের পাঁচ বছরের ভয়ংকর সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে শাহরিয়ার কবীর সম্পাদিত তিন খণ্ডের শ্বেতপত্র— 'বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ১৫০০ দিন' একটি অসাধারণ মানবাধিকার বিষয়ক সংকলন।

ভারত সরকার সঠিকভাবেই শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দিয়েছে। ভারতের আগের জাতীয় নেতারা দলাই লামাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন কিন্তু তিব্বতকে নির্দ্বিধায় উপহার দিয়েছিলেন চীনকে। পশ্চিমবঙ্গের জন্য বিশেষ সতর্কতার কারণ জামাতের বেশিরভাগ জয়ী আসন পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত জুড়ে। ভারত সরকার এখনও কড়া পদক্ষেপ না নিলে পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর পূর্ব ভারতের নিরাপত্তা বিপন্ন হতে পারে।

বাঘ ও বক

এক জঙ্গলে এক বাঘ বাস করত। একবার তার গলায় হাড় ফুটে গিয়েছিল। তাই সে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াতে লাগল। নানাভাবে চেষ্টা করেও সে হাড়টা বের করতে পারল না।

সে এক নিদারুণ অবস্থা। যন্ত্রণায়, রাগে

সে গরগর করছে। ক্রমশ হাড়টি গলায় আরও গেঁথে যাচ্ছে। সেইসঙ্গে ব্যথাটাও বাড়ছে। বেচারা বাঘ! যার ভয়ে জঙ্গলের প্রাণী ভয়ে কাঁপতে থাকে সে কিনা নিজেই কেমন বিপাকে পড়ে ছটফট করছে।

অস্থির হয়ে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করতে তার মনে হলো, কোনো একটা জন্তুকে বললেই তো হয়। সে নিশ্চয় হাড়টা বের করে দেবে। এই ভেবে সে সামনে একটি জন্তুকে দেখতে পেয়ে তাকে ডাকল। সে ফিরেও তাকাল না, ভয়ে ছুটে পালিয়ে গেল।

বাঘ তখন ভাবতে লাগল— এ তো মহা বিপদ। দেখি, একবার পুরস্কারের কথা বলে। এই ভেবে সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল— আমার গলায় হাড় ফুটে গেছে, বড়ো কষ্ট হচ্ছে আমার। যে গলা থেকে হাড়টা বের করে দিতে পারবে, তাকে আমি অনেক পুরস্কার দেব। চিরকাল আমি তার কাছে ঋণী থাকব। দয়া করে কেউ আমার এই উপকারটি কর।

জঙ্গলের জীবজন্তুরা সবাই এই কথা শুনল। কিন্তু নিজেরা বলাবলি করতে লাগল— মাথা খারাপ! ওর গলার হাড় বের করতে যাই আর ও আমাদের ধরে খেয়ে নিক। কে জানে কী মতলবে আমাদের ডাকছে? এই ভেবে কেউই আর বাঘের কথায় সাড়া দিয়ে এগিয়ে এল না।

অনেকক্ষণ এভাবে কেটে গেল। বাঘ ডেকে ডেকে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। কোনো জন্তুই তার প্রস্তাবে রাজি হলো না। অবশেষে গাছের উপরে বসে থাকা একটি বকের মনে বড়ো দয়া হলো। সে ভাবল, আহা, বেচারা কত বিপদে পড়েই না আমাদের ডাকছে। তার উপরে আবার পুরস্কারও দেবে বলছে। দেখি আমি গিয়ে, যদি ওর কষ্ট লাঘব করতে পারি।

এই ভেবে বক বাঘের কাছে এল। ভয়ে ভয়ে ডাকল— বাঘমশাই, ও বাঘমশাই, আমি আপনার গলার হাড় বের করে দেব। আপনি একটু শান্ত হয়ে বসুন।

বাঘ তো মহা খুশি। সে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বককে বলল, তুমি আমার এই উপকারটি কর। আমি তোমাকে খুশি করে দেব। চিরকাল তোমার কাছে ঋণী হয়ে থাকব।

বক মনে মনে খুশি হলেও মুখে বলল— ঠিক আছে, ঠিক আছে। সে দেখা যাবে 'খন। এই বলে সে ধীরে সুস্থে বাঘের কাছে গিয়ে তাকে মুখটা হাঁ করতে বলল। বক ধীরে ধীরে, খুব সাবধানে বাঘের মুখের মধ্যে নিজের মাথা-সহ লম্বা ঠোঁটটি প্রবেশ করিয়ে খুব আলতো করে হাড়টা বের করে আনল।

বাঘ এবারে শান্ত হলো। তার যন্ত্রণা কমে গেল। সে সুস্থ হয়ে উঠল। কিন্তু কই, পুরস্কারের কথা তো বাঘ কিছু বলছে না। বক ভাবল, তাহলে আমিই জিজ্ঞেস করি।

বক তখন একটু সাহস করে বাঘকে বলল, আমাকে তো এবার যেতে হবে বাঘমশাই। আমার পুরস্কারটি যদি দিয়ে দেন তো ভালো হয়।

শুনেই তো বাঘ একটা হুঙ্কার ছাড়ল। আর সেই আওয়াজে বকের পিলে চমকে গেল। বাঘ দাঁত কড়মড় করে, চোখ লাল করে গর্জন করে উঠল— ওরে নির্বোধ! তুই বাঘের মুখে মাথা ঢুকিয়েছিলিস! এত সাহস হলো তোর কী করে? আর তুই যে নির্বিঘ্নে আমার মুখ থেকে তোর মাথাটি বের করে আনতে পেরেছিস, সেটাই তো পরম সৌভাগ্য। আমি যে তোকে খেয়ে ফেলিনি এটাই যথেষ্ট। আবার তুই পুরস্কার চাইছিস? যদি প্রাণে বাঁচতে চাস তো এক্ষুনি, এই মুহূর্তে আমার সামনে থেকে পালিয়ে যা। নইলে তোর ঘাড় মটকে খেয়ে ফেলব।

বোকা বক হতবাক হয়ে উড়ে গিয়ে গাছের ডালে বসল। আর ভাবতে লাগল— দুর্জনের উপকার করে কখনো প্রতিদানের আশা করতে নেই।

—সংগৃহীত

জাতীয় উদ্যান

মুকুন্দরা হিলস্

মুকুন্দরা হিলস্ জাতীয় উদ্যান রাজস্থানের কোটা শহর থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে কোটবন্দিঝালওয়ার ও চিত্তোর জেলায় চম্বল নদীর তীরে এবং মুকুন্দরা ও গগ্রোলো নামের দুই সমান্তরাল পাহাড়ের মাঝখানে অবস্থিত। এটি ৭৫৯.৯৯ বর্গকিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত। এই উদ্যান ৩টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য — দারাহ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, জাতীয় চম্বল অভয়ারণ্য ও জওহর সাগর বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য নিয়ে গঠিত। এটি আগে কোটার মহারাজের শিকার এলাকার অংশ ছিল। ২০০৪ সালে জাতীয় উদ্যানে পরিণত করা হয়। এই উদ্যানের মুকুন্দরা পাহাড়ে বিভিন্ন ধরনের গাছপালা ও বন্যপ্রাণী রয়েছে। এর মাঝখানে তৃণভূমি এবং শুষ্ক পর্ণমোচী বৃক্ষের বন রয়েছে। এই উদ্যানের মধ্যে দিয়ে ৪টি নদী— চম্বল, কালী, আহু ও রমজান প্রবাহিত। এই জাতীয় উদ্যানের প্রধান বন্যজন্তু হলো বেঙ্গল টাইগার, ভারতীয় নেকড়ে ও চিতাবাঘ। উদ্যান পরিদর্শনের সেরা সময় হলো অক্টোবর থেকে মার্চ মাস।

এসো সংস্কৃত শিখি-১০৩

सम्यक् - ভালো। **कथम्** - কেমন?
अभ्यासं कुर्मः -
शचीनः सम्यक् क्रीडति।
শচীন ভালো খেলে।
शचीनः कथम् क्रीडति?
শচীন কেমন খেলে?
राहुलः सम्यक् न क्रीडति।
রাহুল ভালো খেলে না।
लता सम्यक् गायति।
सुस्मिता सम्यक् पठति।
शेखरः सम्यक् भाषणं करोति।
द्राक्षाफलं सम्यक् अस्ति।
स्निग्धा सम्यक् लिखति।
युतकं सम्यक् अस्ति।
(**सम्यक्**-এর স্থলে **सुन्दरम्,उत्तमम्, शोभनम्, समीचीनम्** প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করতে পারি)

ভালো কথা

ঘুঘুপাখি

দুর্গাপূজার পরে আমার পিসিমণি ৪টি টবে চন্দ্রমল্লিকা চারা লাগিয়েছিল। শীতের সময় এক-একটি টবের গাছে ৭৫টি থেকে ১০০টি ফুল ফুটেছিল। পাড়ার সবাই দেখতে আসত। এখন কড়া রোদের তাপে ফুলগুলি শুকিয়ে গেছে। ওই ৪টি টবের মধ্যে একটিতে দু'টি ঘুঘুপাখি কবে যে বাসা বেঁধে ডিম পেড়েছে আমরা দেখতেই পাইনি। আমিই প্রথম দেখেছি। পালা করে দু'টো ঘুঘুপাখি ডিমে তা দিচ্ছে। আমি কাছে গিয়ে দেখেছি, দু'টো ডিম। আমাকে দেখে একটুও ভয় পায়নি। পিসিমণি একটি মাটির সরায় জল রেখে দিয়েছে, ওরা ওখানে থেকে জল খায় আর স্নান করে।

পূজা সরদার, ষষ্ঠশ্রেণী, ক্যানিং, দঃ ২৪ পরগনা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) র সা হি গ	(১) র সু দূ ত হ প রা
(২) র স হ রি	(২) স স ম দৃ ন্ন ম্প ষ্টি

২৩ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার উত্তর
(১) চন্দ্রগ্রহণ (২) চমৎকার

২৩ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার উত্তর
(১) চরিত্রগঠন (২) চরণবন্দনা

(১) বর্ণিনী সরকার, বিএস রোড, মালদা। (২) শৌর্য দত্ত, অভিরামপুর, পঃ মেদিনীপুর। (৩) হৃতিকা মণ্ডল, জয়শ্রী, বাঁশদ্রোণী, কল-৭০। (৪) কৃতিকা মণ্ডল, মকদুমপুর, মালদা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/ সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0550. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রুপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206
9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

‘বন্দে মাতরম্’-এর অঙ্গচ্ছেদ ছিল দেশভাগের পৃষ্ঠভূমি

দুর্গাপদ ঘোষ

এখন থেকে ৫০ বছর আগে ১৯৭৫ সালের ৭ ডিসেম্বর। মধ্য কলকাতার তালতলা স্কুলে ‘বন্দে মাতরম্ শতবর্ষ উদ্‌যাপন সমিতি’র নামে উৎসব করেছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মধ্য কলকাতার বিবেকানন্দ নগর। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সে সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তা অধ্যাপক হরিপদ ভারতী। দীর্ঘ বক্তৃতার মধ্যে তিনি একটা অতি মূল্যবান মত প্রকাশ করে বলেছিলেন ‘বন্দে মাতরম্’ কেবল একটা ধ্বনি নয়, তাহলো একটা মন্ত্র। যা অন্তরাত্মাকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে, অন্তরকে শুদ্ধ করে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চার করে। ‘বন্দে মাতরম্’ একটি মন্ত্রশক্তি যা দেশপ্রেমের প্রেরণা দান করে। এর ঠিক ৫০ বছর পরে এখন সেই ‘মন্ত্রশক্তি’ নিয়ে এই স্বাধীন ভারতে এক শ্রেণীর মানুষকে রীতিমতো কূটকচালি চালাতে দেখা যাচ্ছে। বামপন্থীরা চিরকালই বন্দে মাতরম্ থেকে নিজেদের আলাদা করে রেখেছে। তাই এক্ষেত্রে তাঁরা ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। কিন্তু যাঁরা বন্দে মাতরম্-কে ধ্বনি এবং ক্ষেত্রবিশেষে পুঁজি করে রাজনীতি করে খাচ্ছেন, বন্দে মাতরম্-বিরোধীদের সঙ্গে কোলাকুলি করে তার অঙ্গচ্ছেদকারীদের বুকে জড়িয়ে ধরছেন, এই দেশবন্দনার মন্ত্রের অঙ্গচ্ছেদনকে সমর্থন করার জন্য উদ্বাহু হয়ে মাঠে নেমেছেন, তাঁদের ধিক্কার জানানোরও ভাষা নেই।

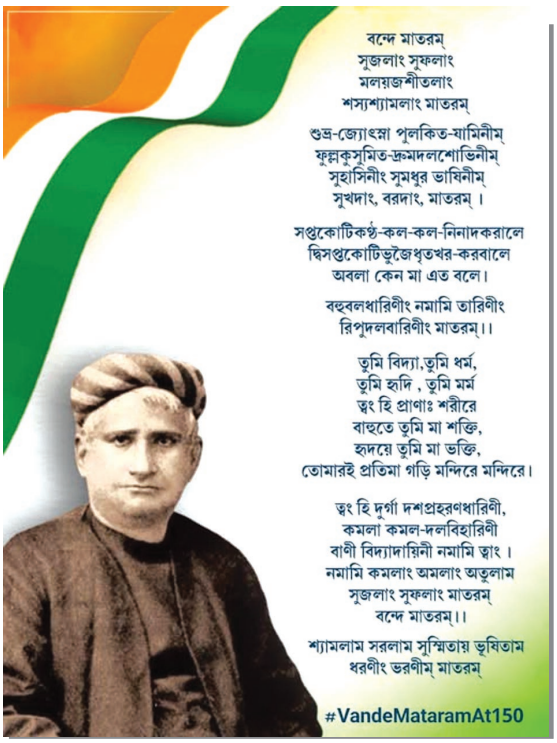

বন্দে মাতরম্-এর অঙ্গচ্ছেদ সম্পর্কে আলোচনায় যাওয়ার আগে দেখে নেওয়া যাক গত ৯ ডিসেম্বর দেশের উপরাষ্ট্রপতি তথা পদাধিকার বলে রাজ্যসভার চেয়ারপার্সন সিপি রাধাকৃষ্ণন কী বলেছেন। তাঁর মতে, বন্দে মাতরম্-এর সমস্তটুকুই হলো মাতৃভূমির প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভক্তির এক ‘অমর গাথা, যা ঐক্য, শক্তি ও সমর্পণের প্রতীক।’ ভারতবর্ষের প্রত্যেক দেশপ্রেমিকের কাছে সম্পূর্ণ বন্দে মাতরম্ ‘অমৃত লহরী’ বলেও মত প্রকাশ করেছেন নবনির্বাচিত উপরাষ্ট্রপতি।

এহেন ‘অমরগাথা’, ‘অমৃত লহরী’, দেশবন্দনার ‘মন্ত্র’-কে কেন এবং কীভাবে খণ্ডিত করা হয়েছে সেকথা দেশপ্রেমিক মহলে বারবার আলোচিত হয়েছে, এখনও হচ্ছে। হওয়া দরকারও। গত ৮ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সংসদে পুনরায় তার ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেশের সর্বপ্রধান জনপ্রতিনিধি হিসেবে তাঁর জাতীয় কর্তব্য পালন করেছেন। জানিয়েছেন যে কংগ্রেস দেশভাগকারী মুসলিম লিগের কাছে নতজানু হয়ে আত্মসমর্পণ করে বন্দে মাতরম্-এর-গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদকে ছেদন করেছে। ওই ৮ ডিসেম্বর দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ লোকসভায় দাঁড়িয়ে বলেছেন, যে বন্দে মাতরম্-কে জাতীয় সঙ্গীত ‘জনগণমন...’-র সঙ্গে সমান মর্যাদা দেওয়ার কথা ছিল তাকে অবজ্ঞা করতে করতে ক্রমে ক্রমে একপাশে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভারত এই গানের মাত্র প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি গাইবে কেন? প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। বন্দে মাতরম্-এর অঙ্গচ্ছেদের সঙ্গে আপোশ করা হয়েছে কেন সে প্রশ্নও তুলেছেন শ্রীসিংহ। আর প্রধানমন্ত্রী তো পরিষ্কার বলেছেন বন্দে মাতরম্-এর অঙ্গচ্ছেদ মেনে নেওয়ার পরিণামেই দেশমাতার অঙ্গচ্ছেদ ঘটেছে। কারণ একটাই— তুষ্টীকরণ।

বলাবাহুল্য, ক্ষমতালোভী কংগ্রেসি নেতাদের সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির কাছে আত্মসমর্পণই হলো বন্দে মাতরম্ ও দেশ— দুইয়েরই অঙ্গচ্ছেদের কারণ। আর এটাই হলো ইতিহাস। ‘Vande Mataram : The Biography of a Song’ শীর্ষক গ্রন্থে ঐতিহাসিক সব্যসাচী ভট্টাচার্য তা পরিষ্কারভাবেই তুলে ধরেছেন। স্বাধীনতার প্রাক্কালে কংগ্রেস যখন সম্ভাব্য

স্বাধীন ভারতের জাতীয় সঙ্গীত কী হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা চলেছিল তখন বন্দে মাতরম্-ই ছিল সম্ভাব্য গীত যা সমগ্র ভারতবাসীর কাছে সবচাইতে বেশি জনপ্রিয় ছিল। বিশেষ করে তা মুখ্যত সংস্কৃতপ্রধান হবার কারণেও ছিল সর্বজনগ্রাহ্য। কিন্তু মুসলমান নেতারা ভারতমাতার বন্দনাসূচক সঙ্গীতকে মেনে নিতে রাজি হলেন না। তাঁরা একে মূর্তি বন্দনার সঙ্গে তুলনা করে জানিয়ে দিলেন যে এটা তাঁদের মজহবে বরদাস্ত করার মতো নয়। তখন কংগ্রেসের সভাপতি জওহরলাল নেহরু নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে যে পত্র লিখেছিলেন তাতে বন্দে মাতরম্ বিরোধীদের বস্তুত 'সাম্প্রদায়িক' বলে চিহ্নিত করেছিলেন— ''Opposition to Vande Mataram was largely 'manufactured by communalists'... 'Whatever we do cannot be to pander to communalist feeling but to meet real grievances where they exist.'' কিন্তু নেতাজীর দিক থেকে সুবিধা হবে না বুঝতে পেরে নেহরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পত্র লেখেন। তাতে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে সম্পূর্ণ বন্দে মাতরম্ একসঙ্গে গাওয়া হলে মুসলমানদের মনে আঘাত লাগতে পারে, তাঁদের কাছে বাধ্যবাধকতা মনে হতে পারে— ...liable to be interpreted in ways that might wound Moslem susceptibities.' সেখানেও তেমন সুবিধা হলো না। ১৯৩৭ সালে তার উত্তরে বিশ্বকবি যিনি ১৮৮১ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের সামনে বন্দে মাতরমের সুর দিয়েছিলেন তিনি সম্পূর্ণ বন্দে মাতরমের সুর দিয়ে শুনিয়েছিলেন, তিনি লিখলেন, কেবল প্রথম দু' পঙ্‌ক্তিকে জাতীয় সঙ্গীত করা হলে গোটা সঙ্গীতটির কথা সব সময় আমাদের স্মরণে থাকবে না— 'But a national Song... which has spontaneously come to consist only of the first two stanzas of the original poem, need not remind us every time of the whole of it.'

কবিগুরুর বক্তব্যের যথার্থ অনুধাবন না করে কংগ্রেসি নেতারা তথা ওয়ার্কিং কমিটি যেন নতুন উদ্যমে উৎসাহিত হলেন। তাঁরা যুক্তি খাড়া করে বলতে শুরু করলেন যে বন্দে মাতরম্-এর প্রথম দুই পঙ্‌ক্তিই হলো তাঁদের জাতীয় আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ— '... a living and inseparable part of our national movement.' তাঁরা আরও প্রচার শুরু করলেন যে, অন্য পঙ্‌ক্তিগুলো নাকি বিশেষ পরিচিত নয় এবং প্রায় গাওয়াই হয় না— 'The other stanzas of the song are little known and hardly ever sung'. কিন্তু ঘটনা হলো, কলকাতা, প্রয়াগ (এলাহাবাদ), লাহোর, বিজয়ওয়াড়া ইত্যাদি জায়গায় কংগ্রেসের অধিবেশনগুলোতে তখনও পুরো বন্দে মাতরম্-ই গাওয়া হতো। আর মিছিল ও জনসভাগুলোতে ধ্বনিত হতো কেবল 'বন্দে মাতরম্।' এ থেকে বুঝতে বাকি থাকে না যে সে সময় মুসলিম লিগকে নেহরু যতই 'সাম্প্রদায়িক' হিসেবে মন্তব্য করুন না কেন, তাদের আপত্তির কাছে নতজানু হয়ে যেমন দেশভাগ মেনে নিয়েছেন তেমনি তার আগে বন্দে মাতরম্‌কে ভাগ করে তার বৃহত্তম অংশ বাদ দিয়েছেন। এবং তার জন্য জোড়াতাপ্পির যুক্তি খাড়া করার চেষ্টা চালিয়েছে কংগ্রেস। সুতরাং, বন্দে মাতরম্-এর অঙ্গচ্ছেদ দেশভাগের গোড়াপত্তন ছিল বলা যেতে পারে। এই দলের নেতারা যদি সত্যি সত্যিই কেবলমাত্র রাজনীতি না করে দেশভাগের বিরোধী হতেন তাহলে দেশবন্দনার অমোঘমন্ত্রকে ছেঁটে ফেলতে আগ্রহী হয়ে উঠতেন না।

আসলে জওহরলাল নেহরু এবং তাঁর তোষামুদেরা এই মানসিকতার দাসত্বে পুষ্ট ছিলেন যে মুসলিম লিগের যে কোনো শর্তে আপোশ করে তাদের সঙ্গে না পেলে স্বাধীনতা সংগ্রাম সফল হবে না। কিন্তু ওই দলে এমন অনেক নেতা ছিলেন যাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে তোষণ নীতি অযৌক্তিক ও বিপজ্জনক দাবিকে প্রশ্রয় দিয়ে মাথায় তোলে। ইতিহাস সাক্ষী, ১৯৪০-এর দশকে মুসলিম লিগ নিজেদের জন্য পৃথক ভূমি তথা পাকিস্তান পাওয়ার জন্য ব্রিটিশ শাসকের সঙ্গে গোপনে আঁতাত করেছিল। এসব বুঝতে পেরে কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হাওড়া কংগ্রেসের অধিবেশনে উষ্মা প্রকাশ করে বলেছিলেন, মুসলমানদের না হলে যদি স্বাধীনতালাভ না করা যায় তবে সে স্বাধীনতা এখন থাকুক। তোষণ নীতিতে যে কোনো লাভ হবে না এটা বুঝেছিলেন চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী যিনি স্বাধীন ভারতের প্রথম এবং একমাত্র গভর্নর জেনারেল হয়েছিলেন।

১৯৩৯ সালে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে একখানা চিঠি লিখে বলেছিলেন, এই জাতীয় তোষণের মানসিকতায় পরিস্থিতিকে রক্ষা করা যাবে না— '...these concession will not save the situation.' কিন্তু নেহরুর চ্যালাচামুণ্ডারা এসব বুঝতে চাননি। বন্দে মাতরম্-কে ছেঁটে খাটো করা নিয়ে খোদ কংগ্রেসের এমনকী মুসলমান নেতাদের একাংশের মধ্যেও যখন বিতর্ক চলছিল সেসময় ১৯৩৯ সালে এক নেহরুভক্ত নেতা রবিশঙ্কর শুক্লা যিনি সেন্ট্রাল প্রভিন্সেস (মধ্যপ্রদেশ) সরকারের শীর্ষনেতা (মুখ্যমন্ত্রী) ছিলেন, তিনি মুসলিম লিগের তৎকালীন সম্পাদক লিয়াকত আলি খানের (পরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন) একটা বোঝাপড়ায় এসেছিলেন যে তাঁর সরকার সরকারি অনুদান প্রাপ্ত ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বন্দে মাতরম্ গাওয়া বাধ্যতামূলক করবে না। স্বাধীন ভারতে উত্তরপ্রদেশের যিনি প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হন, গোবিন্দ বল্লভ পন্ত ১৯৩৯ সালে নেহরুকে চিঠি লিখে বন্দে মাতরম্ সম্পর্কে নতুন তত্ত্ব অর্থাৎ প্রথম দু'পঙ্‌ক্তি গাওয়াকে 'সঠিক' বলে ব্যাখ্যা করে নেহরু ও জিন্না ভজনা করেছিলেন ('...allright so far as it goes)।

ঘটনা হলো, বন্দে মাতরম্ নিয়ে মুসলমানদের আপত্তি ১৯৩৭-৩৯ সালে উঠেছিল এমন নয়। ১৯২০ সাল নাগাদ যখন স্বদেশি আন্দোলন তুঙ্গে উঠেছিল তখন থেকেই তা শুরু হয়েছিল। সে সময় থেকেই মুসলিম জার্নাল এবং সাময়িক পত্রপত্রিকায় বিরোধিতা করে লেখালিখি শুরু হয়। একটি পত্রিকা এমনও লেখে যে এটা হলো মুসলমানদের মূর্তিপূজার দিকে ঠেলে দেওয়া— 'Pushing Muslims towards idolatry : এরপর ১৯৩৭ সালে বন্দে মাতরম্-কে না মানা নিয়ে রাজনীতির পারদ চড়ে যায়। তখন বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস সরকার ক্ষমতাসীন হলে মুসলিম লিগ এক প্রস্তাব পাশ করে কার্যত ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করে। ওই প্রস্তাবে

বন্দে মাতরম্ গাওয়াকে 'ভারতে জাতীয়তাবোধের উত্থানকে প্রশমিত করার চেষ্টা' বলে চাপ সৃষ্টির কৌশল খাটানো হয়। 'Vande Mataram : A Historical Lesson' শীর্ষক এক গ্রন্থে এক প্রখ্যাত আইনজ্ঞ এজি নুরানি মুসলমানদের স্বরে স্বর মিলিয়ে লেখেন যে মুসলমানদের ওপর বন্দে মাতরম্-কে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মুসলিম লিগের সভাপতি এবং দেশভাগ করে পাকিস্তানের দাবি উত্থাপক মহম্মদ আলি জিন্না তো বন্দে মাতরম্-এর প্রথম দুই পঙ্‌ক্তিকেও জাতীয় সঙ্গীত করার বিরোধিতা করেছিলেন। ১৯৩৮ সালে নেহরুকে লেখা এক চিঠিতে জিন্না বন্দে মাতরম্-কে 'মুসলিম বিরোধী' বলেও মন্তব্য করেন।

তবে কোনো কোনো মুসলমান নেতার প্রথম দুই পঙ্‌ক্তিতে আপত্তি তেমন ছিল না। ১৯৩৯ সালে তৎকালীন বিহার সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ড. সইদ মামুদ বলেছিলেন যে, বিহার সরকার যদিও বন্দে মাতরম গানকে বাধ্যতামূলক করেনি কিন্তু তার প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি আপত্তিজনক নয় বলে মনে করে।

কংগ্রেস নেতা রফি আমেদ কিদওয়াইয়ের বক্তব্য ছিল, 'বন্দে মাতরম্' নিয়ে জিন্নার আপত্তি পুরোপুরি রাজনৈতিক। তিনি ঠিকই বলেছিলেন। দেখা গেছে, ১৯৩০ সালের আগে থেকে এনিয়ে লেখালিখি হলেও জিন্না কিন্তু এতদিন কোনো প্রতিবাদ কিংবা আপত্তি করেননি। তখন তিনি এতে 'মুসলমান-বিরোধী' কিছু দেখতে পাননি। বঙ্গের একজন মুসলমান আইনজীবী ও লেখক রেজাউল করিম ১৯৩৭ সালে 'বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলিম সমাজ' শীর্ষক গ্রন্থে লেখেন, বন্দে মাতরম্ বিতর্কের লক্ষ্য হলো 'স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করা।' এখানেই জিন্নার তথা মুসলিম লিগের আপত্তির কারণ বুঝতে পারা যায়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বন্দে মাতরমে আপত্তি তুলে, বিতর্কের অবতারণা করে স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে মুসলমান সম্প্রদায়কে আলাদা করে ফেলা এবং ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মুসলমানদের জন্য পৃথক হোমল্যান্ড বাগিয়ে নেওয়া।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, জিন্নার মতলব থাকতেই পারে। কিন্তু তাতে নেহরু তথা তাঁর কংগ্রেস পরিবারের বৃহত্তম অংশ গা ভাসিয়ে দিয়ে মাতৃবন্দনার মন্ত্রকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবেন? নতি স্বীকার করবেন মুসলিম লিগের 'রাজনৈতিক আপত্তি' এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী দাবির কাছে? আসলে নেহরু অ্যান্ড কোম্পানি চেয়েছিলেন বন্দে মাতরম্ ভাগ কী দেশভাগ, যাই হোক, যেনতেনভাবে ক্ষমতায় বসতে এবং সেই ক্ষমতা যাতে ধরে রাখা যায় তার জন্য মুসলমানদের তোয়াজ করতে। যিনি ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হওয়া সত্ত্বেও ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদে বসে সরকারি টাকায় অযোধ্যার 'বাবরি মসজিদ'-এর সংস্কার করতে চেয়েছিলেন তাঁর কাছ থেকে এটা ছাড়া আর কী আশা করা যায়? বন্দে মাতরম্-এর অঙ্গচ্ছেদ ঘটিয়ে জাতীয় সঙ্গীত করা নিয়ে কংগ্রেসি এবং তার লেজুড় দলনেতারা যে সমস্বরে গলার শিরা ফুলিয়ে চলেছেন তার মৌলিক মানসিকতা তো সেই নেহরু মানসিকতা, মুসলমান তোষণ এবং যেনতেন প্রকারে ক্ষমতা দখলের মানসিকতার রাজনীতি! বন্দে মাতরম্ ও দেশ উভয়ের অঙ্গচ্ছেদের পিছনে জিন্না তথা মুসলিম লিগের দাবির পাশাপাশি এই মানসিকতা আরও বেশি বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখনও নিরন্তর দেশবাসীকে এই মানসিকতা তাড়না করে চলেছে। অঙ্গচ্ছেদ ঘটানোর পরেও এখনও অনেক ক্ষেত্রে বন্দে মাতরম্ 'জনগণমন'-র সমান মর্যাদা পাওয়া দূরে থাকুক, জাতীয় গানটি গাইতে পর্যন্ত আপত্তি উঠেছে।

সংবিধান পরিষদের আয়ু যখন প্রায় অন্তিম পর্যায়ে তখন তার সভাপতি তথা ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেছিলেন, 'জনগণমন' ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হোক কিন্তু যে বন্দে মাতরম্ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক অংশ ছিল তাকেও এর সঙ্গে সমান মর্যাদায় সম্মান করা হোক ('Jana Gana Mana' would be the national anthem and the song 'Vande Mataran' which has played a historic part in the struggle for Indian freedom, shall be honoured equally with 'Jana Gana Mana' and shall have equal status with it.' কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে এখনো অনবরত তা গাইতে আপত্তি তোলা হচ্ছে, বাধা দেওয়া হচ্ছে, কেউ কেউ এটা তাদের 'মজহব-বিরোধী' বলে বিরোধিতা করছেন, বন্দে মাতরম্ গাইবেন না এমনকী বলবেনও না বলে গলাবাজি করে যাচ্ছেন। আর যাঁরা এসব করছেন তাদের সমর্থনে নেমে যুক্তির অবতারণা করছে দাসসুলভ মানসিকতাসম্পন্ন অনেক অশুভ শক্তি! এমনকী ক্ষেত্র বিশেষে সরকারি স্তরেও বন্দে মাতরম্-কে অবজ্ঞা ও অগ্রাহ্য করা হচ্ছে। ১৯৭০-এর দশকে মুম্বই পুরসভা পরিচালিত স্কুলগুলোতে বন্দে মাতরম্ গাওয়া নিয়ে প্রবল বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। ১৯৯৮ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে কেরালার উত্তরাংশের মালাপ্পুরম, ত্রিশূর ইত্যাদি জেলায় সরকারি স্কুলগুলো বন্দে মাতরম্ গাইবার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তা অবজ্ঞা করেছিল। ওই একই বছরে উত্তরপ্রদেশের সরকারি স্কুলগুলোতে গাইবার জন্য নির্দেশ জারি করা হলে মুসলমান সংস্থাগুলো তার প্রতিবাদ করে।

২০১৭ সালে মাদ্রাজ হাইকোর্ট থেকে নির্দেশ জারি করা হয় যে রাজ্যের স্কুল ও কলেজগুলোতে সপ্তাহে একদিন করে বন্দে মাতরম্ গাইতে হবে। কিন্তু তা কেবল অগ্রাহ্য করা হয় তাই নয়, তামিলনাড়ু রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ জানানো হয়। এরকম আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে।

'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রশক্তির স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র নামের 'ঋষি' ১৮৭৫ সালে যখন তা রচনা করেছিলেন এবং ১৮৮১ সালে রচিত 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে তা যখন সন্নিবেশিত হয়েছিল তখন তিনি কল্পনাও করতে পারেননি যে হিন্দুবহুল ভারতে এমন একটা সময় আসবে যখন তাঁর এই অমূল্য সৃষ্টিকে তুষ্টিবাদী রাজনীতির নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করা হবে। পঙ্কিল আবর্তে নিমজ্জিত করে বিশেষ এক 'ধর্ম-বিরোধী' তকমা লাগিয়ে কলুষিত করার চেষ্টা চালানো হবে। দূষিত রাজনীতির যন্ত্রে পরিণত করা হবে স্বাধীনতা সংগ্রামের পবিত্র মন্ত্রকে। আজ ভারতবাসীর সৌভাগ্য যে, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণ বন্দে মাতরম্ গাইবার পক্ষে নির্দেশিকা জারি করেছে। □

আমার সঙ্ঘজীবনের ইতিকথা

অবনীভূষণ মণ্ডল

১৯৬০ সালে মে মাসে আমি স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছি। বেশ একটু মুক্ত চিন্তার মধ্যেই রয়েছি। সারাদিন গ্রামের লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে পড়াশোনা করি আর বিকেল হলেই ফুটবল খেলা। একদিন দেখলাম বেশ কিছু ছেলেকে নিয়ে বন্ধু সুধীর লোহার কিছু দেশীয় খেলাধুলা করছে। তারপর গোল হয়ে বসে কী সব আলোচনা করছে। গানও গাইছে, শেষে সংস্কৃত প্রার্থনা করছে। শুনলাম, সুধীর লোহার সঙ্ঘের একটা ট্রেনিং ক্যাম্পে গিয়েছিল। সেখানে থেকে এক মাসের ট্রেনিং নিয়ে এসেছে। একদিন সুধীর আমাদের বললো, কাল ফুটবল খেলা হয়ে গেলে আমরা একটু বেড়াতে যাবো আর তার জন্য সন্ধ্যার একটু আগে খেলাটা শেষ করতে হবে। পরদিন বেড়াতে গিয়ে সুধীর বললে, একটা সঙ্ঘের ক্যাম্পে সে গিয়েছিল আর সেখানে লাঠি, ছুরিকা, শূল, যোগচাপ ইত্যাদি শেখানো হয়েছে, তার সঙ্গে মিলিটারি ট্রেনিং। তাছাড়া দেশ, ধর্ম, সমাজ সম্পর্কে অনেক আলোচনা হতো। সন্ধ্যাবেলায় শিবাজী মহারাজ, মহারাণা প্রতাপ, স্বামী বিবেকানন্দ, ডাক্তারজী ও শ্রীগুরুজী বিষয়ে প্রবচন হতো। ৩০ দিনের শিবিরে শুল্ক ৫০ টাকা। সুধীরের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না সেজন্য ওই টাকা ডাঃ বিজয় কুমার মণ্ডল দিয়েছিলেন। ওই বছর জেলা থেকে আরও তিনজন গিয়েছিলেন— তরণী মণ্ডল (ডুমুরজুড়ি), বাসুদেব দত্ত (বাঁকুড়া নগর), দেবদাস কুণ্ডু (বাঁকুড়া)। ক্রমেই ফুটবল খেলার সময় কমিয়ে দিয়ে শাখায় আসতে লাগলাম। বাঁকুড়া শহর থেকে আমাদের গ্রাম মোলবনা ১৭ কিলোমিটার দূরে। একদিন বাঁকুড়া থেকে সাইকেল করে এলেন প্রচারক মনমোহন রায়। সেদিন শাখায় সংখ্যা অনেক ছিল। বেশ উৎসাহের সঙ্গে খেলাধুলা হলো, তারপর গোল হয়ে বসে গেলাম। একে একে 'দক্ষ' দাঁড়িয়েপরিচয় দিতে হলো—নাম, কোন শ্রেণীতে পড়ি? কোন স্কুলে পড়ি? কেউ কেউ শ্রেণীর জায়গায় Class বললে তিনি বলেন ক্লাস নয় শ্রেণী বলতে হবে।

বাবার নাম বলতে হলে 'শ্রী' দিয়ে শুরু হবে। মনমোহনদা একটি দেশপ্রেমের গান গাইলে পঙ্‌ক্তিবদ্ধ আমরাও গলা মিলিয়ে অনুসরণ করতে লাগলাম। তারপর একটি সুন্দর গল্প বললেন। তারপর দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করে শাখা শেষ হলো। কলকাতা থেকে বিস্তারক এলেন দীপঙ্কর সেনগুপ্ত। শাখা খুব ভালোভাবে চলতে লাগলো। দীপঙ্করদার খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা আমরা বাড়ি বাড়ি করতাম। বিভাগ প্রচারক ডাঃ সুজিত ধর এলেন মোলবনা শাখাতে। সুজিতদা এমবিবিএস পাশ করার টিডিডি-তে গোল্ড মেডালিস্ট হয়ে প্রচারক বেরিয়েছেন। ডাঃ বিজয় কুমার মণ্ডল তাঁর সঙ্গে টিডিডি পড়তেন, সেই সূত্রে সুজিতদার সঙ্গে আলাপ হয়। সুজিতদা সকলের বাড়ি বাড়ি যেতেন। তিনি চা খান না সেজন্য অনেক বাড়িতে দুধের ব্যবস্থা করা হতো। এতো বড়ো ডাক্তার শাখায় এসেছেন জেনে গ্রামের লোকেরা খুবই বিস্মিত। পরে একদিন এলেন প্রান্ত প্রচারক বসন্তরাও ভট্ট। মহরাষ্ট্রীয় হলেও শুদ্ধ বাংলা বলেন। সেদিন খুব ভালো সংখ্যায় স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিল। মাঝে মাঝে বিভিন্ন জায়গা থেকে স্বয়ংসেবকরা আসতে আরম্ভ করলো। বাঁকুড়া নগর থেকে মনমোহনদার সঙ্গে এলেন কালুদা (দেবদাস কুণ্ডু)। ওন্দা থেকে এলেন বর্ধমানের তরুণকান্তি কর ও নদীয়া জেলার বিজনকৃষ্ণ কুলভী। তাঁরা দুজনেই ওন্দায় চাকুরি করতেন। শাখাতে খুব উৎসাহের সঙ্গে কবাডি খেলাও শুরু হয়ে গেল।

১৯৬১ সালে মোলবনা শাখা থেকে দুজন ওটিসি-তে গেল— অজিত বারিক ও গোপাল মণ্ডল। সে বছর বর্ধমান মহন্তস্থলে ওটিসি হয়। ওই বছর আমার প্রি-ইউনিভার্সিটি পরীক্ষা থাকায় আমি ওটিসি-তে যেতে পারিনি। কিন্তু ওটিসি দেখতে যাই। সেখানে গিয়ে বসন্তদা ও সুজিতদাকে মাঠে দেখলাম। বসন্তদা শূলের শিক্ষক ছিলেন। খড়্গ, ছুরিকা ও দণ্ড শেখানো হচ্ছে দেখলাম। সকালে ও বিকেলে মাঠে কার্যক্রম দেখলাম, খুব উৎসাহ পেলাম। ওই বছর পূজার পর থেকে বাঁকুড়া শহরে নতুনগঞ্জে একটা মেসে থাকতে শুরু করলাম। তখন লালবাজার পুলিশ ফাঁড়ির পিছনে একটি মাঠে শাখা চলতো। আমি ওই শাখায় যাওয়া শুরু করলাম।

১৯৬২ সালে লালবাজার সঙ্ঘস্থানে শ্রীগুরুজী এলেন। কার্যক্রমে সভাপতি হিসেবে শহরের বিশিষ্ট হিন্দুত্ববাদী অ্যাডভোকেট শ্রী রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ছিলেন। মাঠে প্রবেশের সময় ঘোষ বাজলো। ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত, সুন্দর দাড়ি, সৌম্য চেহারা দেখেই একজন সন্ত বলেই মনে হলো শ্রীগুরুজীকে। সঠিক সময়ে শাখা শুরু এবং ঘড়ি না দেখে ঠিক একঘণ্টা ভাষণ। এই কার্যক্রমে রামপ্রসাদ গুপ্তের কণ্ঠে একক গীত হলো— 'বিজয় পথের সংগ্রামী দল অযুত কণ্ঠে বিজয় গাও'। শ্রী গুরুজীর সংস্কৃত নিষ্ঠ ভাষণ বোঝার খুব একটা অসুবিধা হয়নি। বাঁকুড়া জেলা ও পুরুলিয়া জেলার স্বয়ংসেবকদের সম্মেলন ছিল। তারপরেই ওই শাখায় আমাকে শিক্ষকের দায়িত্ব দেওয়া হলো। তখন ওই মাঠেই প্রভাত শাখা হতো।

১৯৬২-তেই আমি মেস ছেড়ে দিয়ে মহামায়াস্থানে নিবাসে থাকতে লাগলাম। তখন

পাটপুর হোস্টেলের পিছনের মাঠে আর একটি নতুন শাখা শুরু হয় (জেলখানার পিছনে)। ওই শাখায় আমাকে মুখ্য শিক্ষকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ওই মাঠে (শাখাতে) আসতো প্রশান্ত দত্ত, সন্তোষ রায়, সুভাষ রায়, কল্যাণ রায়, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, লোকনাথ চট্টোপাধ্যায়, ব্রজবাসী বিশ্বাস প্রমুখ। ওই সময় বাঁকুড়া নগরে বিস্তারক হিসেবে আসেন ডাঃ চিন্ময় শীল (দাঁতের ডাক্তার) কলকাতা থেকে।

পরে আসেন দুর্গাদাস সেনগুপ্ত বহরমপুর থেকে। নিবাসে থাকার ফলে পড়াশোনায় ঠিকমতো সময় দিতে না পারায় B. Sc Part I-এর ফল খারাপ হয়। সেজন্য নিবাস ছেড়ে কাটজুড়িডাঙ্গায় একটি মেসে চলে আসি। ওখানেও শাখা শুরু হলো। কাটজুড়িডাঙ্গা শাখা চালু হলে নতুনচটীতে শাখা শুরু করলাম। মেসে থাকাকালীন অনেকে আমার হাফপ্যান্ট পরা দেখে ব্যঙ্গ করতো। তাদের আচার আচরণ আমার ভালো লাগেনি। সেজন্য আমরা দুজন (মহিমরঞ্জন পাণ্ডা ও আমি) আলাদা হয়ে নিজেরাই রান্না করে খেতে লাগলাম। ১৯৬৪-তে আমি ভালোভাবেই বি এসসি পার্ট-১ পাশ করলাম।

সেসময় কলেজ ছাত্রদের প্রাইভেট টিউশনের চল ছিল না। মে-জুন মাসে প্রতি বছর পরীক্ষা থাকতো বলে OTC-তে যেতে পারিনি কিন্তু প্রতি বছরই গ্রীষ্মের ছুটিতে অথবা পূজার ছুটিতে বিস্তারক হিসেবে গিয়েছি। বাঁকুড়া জেলার তালডাংরাতে, পুরুলিয়া জেলার আদ্রা, আনাড়া ও রঘুনাথপুরে বিস্তারক হিসেবে গিয়েছি। আদ্রাতে বিস্তারক হিসেবে যাই। গ্রীষ্মকালে থাকার ব্যবস্থা হয় 'ঝাঁঝড়িয়া ধর্মশালায়'। খাবার ব্যবস্থা ছিল আদ্রা স্টেশন বাজারে চা ব্যবসায়ী দশরথ সিংহানিয়ার বাড়িতে। ধর্মশালা থেকে দুই কিমি দূরত্বে শাখার মাঠ পোস্টাফিসের পাশে। রেলওয়ে কোয়ার্টার থেকেই বেশিরভাগ স্বয়ংসেবক আসতো। শুনলাম এক বছর আগে সিউড়ী থেকে বিস্তারক হিসেবে এসেছিলেন সুকুমার দাস। রঘুনাথপুরে যখন বিস্তারক যাই তখন পুরুলিয়া জেলা প্রচারক ছিলেন বাসুদেব ঝুনঝুনওয়ালা। ওখানে গোকুল সেনের বাড়িতে থাকতাম আর খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল হোটেলে।

১৯৬৪ সালে সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে যাওয়ার সুযোগ হলো। ওই বছর সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ হয় হুগলী জেলার মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, রিষড়াতে। তখন শিক্ষাবর্গ হতো তিনটি প্রদেশ, অসম, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গ মিলে। ১ম বর্ষ ও ২য় বর্ষ এক সঙ্গেই হতো।

শারীরিক আলাদা, তবে বৌদ্ধিকবর্গ এক সঙ্গেই। খুব সুন্দর পরিবেশ। সেই বছর দ্বিতীয় বর্ষে শিক্ষার্থী ছিলেন গৌরদা, ধর্মদা, বিশ্বনাথ সরকার প্রমুখ। ওড়িশা থেকে দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষক ছিলেন বাবুরাওজী পালধিকর, নারায়ণ ভৌমিক (১ম বর্ষে)। অসম থেকে এসেছিলেন ওখানের বিভাগ প্রচারক শশীকান্ত চৌথাইওয়ালে। প্রথম বর্ষের শিক্ষক হিসেবে ছিলেন প্রদীপ ঘোষ, মনমোহন দা, শ্যামমোহন দা, বংশীলাল সোনী, রোহিণীদা প্রমুখ।

অমলদার বৌদ্ধিক 'হিন্দুত্বই রাষ্ট্রীয়ত্ব' বিষয়টি গভীরভাবে মনে রেখাপাত করে। বসন্তদার বৌদ্ধিক ছিল 'ব্যক্তি চরিত্র ও রাষ্ট্রীয় চরিত্র'। এটাও খুব ভালো লেগেছিল। সমগ্র ভারতে প্রতিটি সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে শ্রীগুরুজী উপস্থিত থাকতেন। পূজনীয় শ্রীগুরুজীর দুদিন দুটি বৌদ্ধিক হতো। এখানেও তাই হলো। দুপুরে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে খেতে বসতেন। তাছাড়া কেন্দ্রীয় কার্যকর্তাদের মধ্যে ছিলেন একনাথজী, ভাইয়াজী দানী প্রমুখ। একনাথজীর স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে শুনেছিলাম, এই বর্গে তা প্রত্যক্ষ করলাম। প্রায় ৬০ জন স্বয়ংসেবকের বৈঠক নিচ্ছিলেন। পরিচয় দিলাম। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন কার্যবাহ কে কে আছে হাত উঠাও। এরপর একনাথজী বললেন শাখার মুখ্য শিক্ষক কতজন হাত ওঠাও। ছাত্র কত জন? ব্যবসায়ী কতজন হাত ওঠাও। এরপর একনাথজী জিজ্ঞাসা করলেন কার মনে হচ্ছে আমি তার পরিচয় দিতে পারবো না? কয়েকজনই উঠে দাঁড়ালেন তিনি প্রত্যেকের নাম, দায়িত্ব এবং কী করে তা বলে দিলেন। সেই বছরই সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর মৃত্যু হয়। সেজন্য তিনদিন বর্গে ধ্বজ উঠেনি এবং নিয়মিত শারীরিক কার্যক্রম বন্ধ ছিল। কিন্তু বৌদ্ধিক কার্যক্রম নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী হচ্ছিল। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে মাস্টারমশাই কেশব চন্দ্র চক্রবর্তী বিভিন্নভাবে শিক্ষার্থীদের ব্যস্ত রেখেছিলেন প্রবচনের মাধ্যমে। কখনো শ্রীকৃষ্ণ ও কালযবনের উপাখ্যান, কখনো গীতার একটি শ্লোক নিয়ে তার ব্যাখ্যা করতেন। পথ সঞ্চলন হয় রিষড়া থেকে শ্রীরামপুর পর্যন্ত। ১৯৬৪ সালে শ্রীগুরুজীর উপস্থিতিতে কার্যক্রম হয় বাঁকুড়া বিভাগের বাঁকুড়া নতুনগঞ্জে ফুলচাদ বাবুর রোডে। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন জেলা সঙ্ঘচালক ডাঃ বিজয় কুমার মণ্ডল। একক গীত পরিবেশন হয় প্রতাপ গুপ্তের কণ্ঠে। 'জগত জননী ভারতবর্ষ তেজে পুঞ্জময়।.....' (ক্রমশ)

শোকসংবাদ

কলকাতা বাঘাযতীন ভাগের স্বয়ংসেবক অচিন্ত্য কুমার মণ্ডল গত ২১ ফেব্রুয়ারি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। পেশায় আইনজীবী ছিলেন। দক্ষতার সঙ্গে আইনব্যবসায় যুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর মা, বাবা, ২ ভাই, ১ বোন, স্ত্রী, ১ কন্যা, ১ পুত্রকে রেখে গেছেন। তিনি হাওড়ার উলুবেড়িয়ার স্বয়ংসেবক হন। সঙ্ঘের বিভিন্ন দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছেন। এক সময় বিজেপির যাদবপুর পশ্চিম মণ্ডলের কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছেন।

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

*** বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

বাঙ্গালি কি আর গান গাইবে না?

বিপ্লব বিকাশ

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া দুটি ঘটনা---লগ্নজিতা চক্রবর্তীর কণ্ঠে 'জাগো মা' গান থামিয়ে দেওয়া এবং অ্যাকোয়াটিকায় ডিজে কনসার্টে উন্মত্ত মবের তাণ্ডব কেবল বিচ্ছিন্ন কোনো বিশৃঙ্খলা নয়। এগুলো আসলে এক বৃহত্তর ও গভীর ষড়যন্ত্রের ট্রেলার। রমজান মাস চলছে বলে গান-বাজনা বন্ধ করে দিতে হবে, এমন ফতোয়া এ রাজ্যে কবে থেকে শুরু হলো? যে মাটি নজরুল-রবীন্দ্রনাথের মিলনভূমি, আজ সেখানে সুরের গলায় ফাঁস পরানো হচ্ছে। মনে হচ্ছে মোল্লাবাদের কাছে আমাদের স্বাধীনতা বন্ধক রেখে দিয়েছি।

পশ্চিমবঙ্গ আজ রাজনৈতিক 'তুষ্টীকরণ'-এর গবেষণাগারে পরিণত হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ক্ষমতার মসনদ টিকিয়ে রাখতে গিয়ে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের উগ্র মানসিকতাকে যে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে, আজ তারই ফল ভোগ করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। যখন প্রশাসন ভোটের সমীকরণের কাছে নতমস্তক হয়ে থাকে, তখন জেহাদি উগ্রবাদীরা সাহস পেয়ে যায় সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় ফতোয়া জারি করার। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা এবং সরকারের 'দেখেও না দেখার' ভান মোল্লাবাদীদের মনে এই বিশ্বাস গেঁথে দিয়েছে যে, তারা আইনের ঊর্ধ্বে। মিডিয়াতে শোনা যাচ্ছে যে, ধরা পড়া জঙ্গির বাড়ি লোক বলছে 'আমরা তৃমমূল করি'। মনে হয় তৃণমূল করাটা অপরাধ করার জন্য ছাড়পত্র দিয়ে রেখেছে।

বর্তমান পরিস্থিতি দেখে আমাদের বারবার শিউরে উঠতে হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গেও বাংলাদেশের মতো অবস্থা। বাংলাদেশে বাউল শিল্পীদের চুল কেটে দেওয়া হচ্ছে, গান গাওয়ার অপরাধে শিল্পীদের ওপর জেল-জুলুম চলছে, এমনকী পিটিয়ে মেরে ফেলার মতো নৃশংস ঘটনাও ঘটছে। বাউল গান কেবল একটি সঙ্গীত নয়, এটি বাঙ্গালির আধ্যাত্মিক ও লৌকিক শিকড়। সেই শিকড় উপড়ে ফেলার চেষ্টা যখন বাংলাদেশে সফল হয়, তখন সেই আগুনের আঁচ এপারে পৌঁছতে দেরি হয় না। 'জাগো মা' যখন আটকানো হলো তখন রাজ্যের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা মৌন! মুখ্যমন্ত্রী বাঙ্গালি আবেগকে কাজে লাগিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে কোনো সুযোগ ছাড়েন না। কিন্তু যখন জেহাদিদের হামলা থেকে বাঙ্গালিকে বাঁচানোর থাকে তখন তো তিনি মৌনরূপ ধারণ করেন কিংবা বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য দিয়ে বেরিয়ে যান।

আজ যদি অ্যাকোয়াটিকায় গান থামানোকে দেওয়া প্রশ্রয় হয়, তবে কাল হয়তো আপনার 'বাড়ির পূজা' করাটাও বন্ধ হবে। স্কুলের সরস্বতী পূজা, কয়েকটি অঞ্চলের দুর্গাপূজা, কার্তিক পূজা বন্ধ। কালকে অনুষ্ঠান বাড়ির ও চৈত্র সেলের সানাইও এই ফতোয়ার কোপে পড়বে। বাংলাদেশের হিন্দুরা আজ যেভাবে অস্তিত্ব সংকটে, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু সমাজও সেই একই পথের পথিক হতে চলেছে।

শিল্পীরা আজ গান গাইতে ভয় পাচ্ছেন। শিল্পীরা আজ মঞ্চে ওঠার আগে ভাবছেন, কোন গান গাইলে কার মজহবি অনুভূতিতে চোট লাগবে। 'জাগো মা' গান গাওয়া যদি আজ অপরাধ হয়ে দাঁড়ায়, তবে বুঝতে হবে আমরা আমাদের স্বাধীনতাকে জেহাদিদের কাছে বন্ধক রেখে দিয়েছি।

পশ্চিমবঙ্গের এই অপশাসনকে স্পষ্ট বার্তা দিতে হবে যে, কোনো মব-তন্ত্র বা কোনো নির্দিষ্ট মজহবের ফতোয়া মেনে চলবে না রাজ্যবাসী। এ মাটি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মাটি, এ মাটি ড. শ্যামাপ্রসাদের মাটি। রাজনৈতিক দলগুলো তাদের ভোটের ঝুলি ভরতে গিয়ে যেন বঙ্গীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে নিলামে না চড়ায়।

হিন্দু সমাজ যদি আজ এই তুষ্টীকরণের রাজনীতির বিরুদ্ধে এবং নিজেদের অধিকার রক্ষায় জাগ্রত না হয়, তবে ইতিহাস বাঙ্গালিকে ক্ষমা করবে না। মনে রাখতে হবে, আজ সে সুর থামিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কাল সেই নিস্তব্ধতা সকলের ঘরের ভেতরেও প্রবেশ করবে।

সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক হলো, যখন বাঙ্গালি সংস্কৃতির টুঁটি টিপে ধরা হচ্ছে, তখন নবান্নের পক্ষ থেকে এক রহস্যময় নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার, যা কথায় কথায় 'বঙ্গ সংস্কৃতি' আর 'মা-মাটি-মানুষের' দোহাই দেয়, আজ তারা কেন এই ফতোয়াবাজ মব-তন্ত্রের সামনে নতজানু? ভোটের পাটীগণিত কি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে নিজের রাজ্যের শিল্পীদের নিরাপত্তা ও ঐতিহ্যের চেয়েও তা বড়ো হয়ে দাঁড়াল? শুধু শাসকদলই নয়, এই তথাকথিত প্রগতিশীল 'কমিউনিস্ট' ও বামপন্থী অ্যাক্টিভিস্ট, যারা তুচ্ছ কারণেও পথ অবরোধ করেন, আজ তারা কোথায়? বাংলাদেশের বাউল শিল্পীদের ওপর যখন আঘাত আসে বা এপারে 'জাগো মা' গান থামিয়ে দেওয়া হয়, তখন এই তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের মোমবাতি মিছিল কেন বেরোয় না? এই নীরবতা আসলে সম্মতিরই নামান্তর। তাদের এই 'সিলেক্টিভ' প্রতিবাদ করার অভ্যেস আজ পশ্চিমবঙ্গকে এক অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

এখন আর এই তৃণমূল দলের শাসনের ওপর ভরসা রাখার সময় নেই। সাধারণ মানুষকে আজ নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে। যদি প্রশাসন তুষ্টীকরণের নেশায় অন্ধ হয়ে যায় এবং বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে মোল্লাবাদকে প্রশ্রয় দেয়, তবে বঙ্গ সংস্কৃতি রক্ষার দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, আজ যদি এই ফতোয়া মেনে নিই, তবে আগামী প্রজন্মকে এক কট্টরপন্থী ও সুরহীন উত্তরাধিকার দিয়ে যেতে হবে। সেখানে গান গাইতে গেলে অনুমতি নিতে হবে জেহাদি গোষ্ঠীর কাছ থেকে। রাজ্যবাসীর নীরবতাই কিন্তু রাজ্যের ধ্বংসের পরোয়ানা লিখে দিচ্ছে। বাঙ্গালির উচিত নিজেকে একবার জিজ্ঞেস করা 'এই অবস্থা কী করে তৈরি হলো? এমতাবস্থায় আমরা স্বাধীন ভাবে, সসম্মানে বাঁচতে পারবে তো?' □

পরলোকে পূর্বতন প্রচারক প্রদীপ ঘোষ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বতন প্রচারক তথা মালদা বরেন্দ্র মহকুমার পূর্বতন সঙ্ঘচালক প্রদীপ ঘোষের জীবনাবসান হলো গত ২৪ ফেব্রুয়ারি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি শিক্ষক ছিলেন। দীর্ঘ রোগভোগের পরে কলকাতার শ্রীবিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী মাড়োয়ারি হাসপাতালে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি স্ত্রী, এক পুত্র ও পুত্রবধূ-সহ বহু গুণমুগ্ধ বন্ধুকে রেখে গেছেন। স্বদেশি জাগরণ মঞ্চের পূর্বক্ষেত্র সহ-সংযোজক অম্লানকুসুম ঘোষ তাঁর একমাত্র পুত্র। প্রথম জীবনে (১৯৫৫-৫৬) রাজ্য সরকারি কর্মী ছিলেন। সঙ্ঘের তৃতীয় বর্ষ প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করার পর চাকরি ছেড়ে প্রচারক জীবনে প্রবেশ করেন।

১৯৫৯-এ তাঁর প্রচারক জীবন শুরু হয়। প্রথমে বর্ধমানে নগর প্রচারক, তারপরে উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়ি কোচবিহার ও শিলিগুড়িতে যথাক্রমে জেলা ও বিভাগ প্রচারক ছিলেন। ১৯৬৭-১৯৬৯ বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল কমিটির পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের সংগঠন সম্পাদক ছিলেন। তিনি ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য এবং কলকাতা মহানগরের বৌদ্ধিক প্রমুখ ছিলেন। এই সময়কালে তিনি স্বনামে এবং বজ্র ঘোষ ছদ্মনামে স্বস্তিকায় প্রচুর প্রবন্ধ, নাটক, গল্প, উপন্যাস, গান লিখেছেন। ১৯৭৯ সালে উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক হয়ে তিনি গার্হস্থ্যজীবনে পুনঃপ্রবেশ করেন। প্রথমে জলপাইগুড়ি জেলার বেলাকোবা ও পরে মালদা জেলার ইংরেজবাজারের ললিতমোহন শ্যামমোহনী স্কুলে শিক্ষক রূপে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৮০ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত মালদা জেলার বৌদ্ধিক প্রমুখ ছিলেন। ১৯৮২ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের বৌদ্ধিক প্রমুখ ছিলেন। ১৯৯৫ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত মালদা জেলার বরেন্দ্র মহকুমার মহকুমা সঙ্ঘচালক রূপে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০০ সালে ললিতমোহন শ্যামমোহনী স্কুলের শিক্ষকতা থেকে অবসরগ্রহণ করেন। তিনি ইংরেজির শিক্ষক ছিলেন। ২০০৫ সাল থেকে তিনি হাওড়া জেলার বালিতে বসবাস করতেন।

সংযোজন

বিজয় আঢ্য ॥ প্রদীপদা চলে গেলেন। বয়স অবশ্য হয়েছিল। প্রদীপ ঘোষ কলকাতার গোয়াবাগান শাখার স্বয়ংসেবক। ডাঃ সুজিত ধর, ডাঃ চিন্ময় শীল, ডাঃ দীপক দাশগুপ্ত— এরা সবাই গোয়াবাগান শাখার স্বয়ংসেবক। বর্তমানে শুধু চিন্ময়দাই রয়েছেন। ১৯৬৩ সালে বর্ধমানের মহন্তস্থলে সঙ্ঘের যে ওটিসি (সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ) হয়েছিল, সেখানে প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী হিসেবে গিয়েছিলাম। সেই বর্গের বৌদ্ধিক প্রমুখ ছিলেন প্রদীপদা। মুখ্যশিক্ষক কেশবরাও দীক্ষিত। বর্গ কার্যবাহ তৎকালীন ওড়িশার প্রান্ত প্রচারক বাবুরাও পালাধিকরজী। তখন প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় বর্ষ, এমনকী অসম প্রদেশের শিক্ষার্থীরাও ছিল। তবুও মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা একশোর কম-বেশি হবে। বাঁকা নদীর তীরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্দির সংলগ্ন এই চত্বর ছিল বেশ মনোরম। এই বর্গেই সঙ্ঘের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি। প্রতিজ্ঞা পাঠ করিয়েছিলেন প্রদীপদাই। প্রতিজ্ঞা হয়েছিল তৎকালীন বঙ্গপ্রদেশের প্রান্ত প্রচারক বসন্তরাও ভট্টের উপস্থিতিতে। প্রদীপদা সেই সময়ে সঙ্ঘের জলপাইগুড়ি বিভাগ প্রচারক ছিলেন।

সঙ্ঘের প্রাক্তন সরকার্যবাহ মাননীয় একনাথজী রানাডে-র তত্ত্বাবধানে কন্যাকুমারীতে বিবেকানন্দ শিলা স্মারক নির্মাণের কাজ শুরু হলে প্রদীপদা কলকাতায় স্মারক সমিতির কার্যালয়ের কাজ দেখতেন। সেসময় অর্থাৎ ১৯৬৯-তে কাটোয়াতে ছিলাম। একদিন প্রদীপদা কাটোয়াতে এলেন। বিবেকানন্দ শিলা স্মারক নির্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজ কেমন চলছে, তারই সব খোঁজখবর নিলেন। সেই সময় প্রদীপদা তাঁর প্রাক্তন শিক্ষকের (এই মুহূর্তে নামটা মনে পড়ছে না। তিনি তখন কেডি স্কুলে পড়াতেন) সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। গুরু-শিষ্যের সেই সাক্ষাৎকারটি এখনও মনে আছে।

কন্যাকুমারীতে বিবেকানন্দ শিলা স্মারক মন্দিরে যখন গেছি, তখন সেখানকার প্রদর্শনীতে প্রদীপদারও ছবি দেখেছি। এই সময়ে কলকাতায় থাকাকালীন সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে যুক্ত ছিলেন। আট পাতার ট্যাবলয়েড পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠায় 'বজ্রঘোষ' নামে একটা ধারাবাহিক কলম ছিল। বজ্রঘোষের আড়ালে ছিলেন প্রদীপ ঘোষ। এরপর কর্ম উপলক্ষ্যে উত্তরবঙ্গে চলে যাওয়ার জন্য প্রদীপদার সঙ্গে যোগাযোগ অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তবে কর্মসূত্রে স্বস্তিকার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর প্রদীপদার সঙ্গে আবার যোগাযোগ ঘটে। বিশেষত প্রদীপদার পুত্র অম্লান স্বস্তিকায় লেখালিখি শুরু করলে সম্পর্কটা আরও বাড়ে। বালিতে নতুন বাড়িতে অনেকবারই গিয়েছি। শেষ গিয়েছি গত জুলাই মাসে সুনীলদা (গোস্বামী) ও সুকেশের (মণ্ডল) সঙ্গে। বেশিরভাগই স্মৃতিচারণা। কে না জানে—স্মৃতি সততই সুখের।

শেষের কদিন টানাপোড়েন চলছিল। শেষপর্যন্ত শেষের সেইদিন এল। কেশব ভবনে প্রদীপদার মরদেহে মাল্যার্পণের মাধ্যমে একটা অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটলো। বঙ্গের তৃতীয় প্রজন্মের স্বয়ংসেবকদের বেশিরভাগই ইহজগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন। বাকিরাও দিন গুনছেন। এটাই কালের নিয়ম— 'ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।' □

গল্পকথায় ডাক্তারজী

(৬৫)

অশনিসংকেত

বাইরে থেকে শারীরিক দুর্বলতার বিষয়টি উপলব্ধি করে এক কার্যকর্তা ডাক্তারজীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি তাঁর স্বভাব সুলভ হাসির মাধ্যমে উত্তর দিলেন— 'আমার আবার কী হবে? আমার স্বাস্থ্য ঠিক আছে'। প্রবল ধ্যেয়নিষ্ঠা, আত্মশক্তির দ্বারা শরীরকে যিনি মনের দাস করে রাখতে পারেন তাঁর পক্ষে এমন উত্তর খুব স্বাভাবিক। প্রকৃত অবস্থা এমন ছিল না, জঙ্গল সত্যাগ্রহের পরে অকোলা জেলে থাকাকালীনই ডাক্তারজীর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। জেল থেকে বাইরে আসার পরে এতদিনের কাজের শূন্যতা বা ক্ষতিকে পূরণ করার জন্য দিন-রাত নিরন্তর ভ্রমণ, পরিশ্রম শুরু করেন। বিদর্ভের পরে মধ্যপ্রান্ত ও ছত্রিশগড়ের হিন্দিভাষী অঞ্চলে সঙ্ঘকার্য বিস্তারে প্রয়াসী হন। ইতিমধ্যে ১৯৩২ সালে অসহযোগ আন্দোলন পুনরায় গতিশীল হলে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের পুনরুদ্দীপিত করে শাখাগুলি শক্তিশালী করার প্রয়াসী হন। তার মাঝে ও বছরই ১৫ ডিসেম্বর মধ্যপ্রান্ত সরকারের মুখ্যসচিব শ্রী ই.গউন এক নির্দেশনামা প্রচার করে জানান যে— রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক হওয়ার কারণে সরকারি কর্মচারীদের সঙ্ঘে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করা হলো। এটা তৎকালীন অবস্থায় সঙ্ঘের উপরে বড়ো আঘাত ছিল। এটা ছিল সঙ্ঘের অগ্রগতিকে প্রতিহত করার সরকারি কুপ্রয়াস।

'সঙ্ঘ সাম্প্রদায়িক'— এই অপবাদকে মিথ্যা প্রমাণ করতে ডাক্তারজী বহুমুখী প্রয়াস শুরু করলেন। যুক্তি তথ্যের মাধ্যমে মধ্যপ্রাপ্ত সরকারের এই অবিবেচনাপূর্ণ সিদ্ধান্তের ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করলেন। সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের সঙ্ঘকার্যক্রমে নিয়ে এসে তাদেরকে সঙ্ঘের চাক্ষুষ উপলব্ধি করালেন। ডাক্তারজী জানতে চাইলেন— সঙ্ঘ যদি রাজনৈতিক সংগঠন তা হলে বলা হোক সঙ্ঘ কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে? হিন্দুস্থানের কোথায় কোন অহিন্দু সমাজের উপরে আক্রমণের চেষ্টা করে সাম্প্রদায়িকতার পরিচয় দিয়েছে? নিজ সমাজের সংস্কার উন্নতির জন্য প্রতিষ্ঠিত সংস্থা সাম্প্রদায়িক কেমন করে হয়? তাহলে 'ইউরোপিয়ান অ্যাসোসিয়েশন', 'ইউরোপিয়ান চেম্বার অব কর্মার্স'ও সাম্প্রদায়িক, সেখানে সরকারি কর্মচারীদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ নয় কেন? একদিকে সরকারি বিরোধিতাকে প্রতিহত করা অপরদিকে বোম্বাই থেকে করাচী পর্যন্ত সঙ্ঘ বিস্তারের নিরবচ্ছিন্ন ভ্রমণ, বৈঠক, ভাষণ শরীরের উপর যে তার প্রভাব ফেলবে তাতে অসম্ভব কী? ডাক্তারজী সেই স্বয়ংসেবকের প্রশ্নের উত্তরে যাই বলুন শারীরিকভাবে তিনি তখন প্রকৃতই অসুস্থ। নিরন্তর পরিশ্রম, মানসিক চিন্তা ও অর্থের টানাটানির সঙ্গে নিত্যনতুন সমস্যার আঘাত শরীরকে জর্জরিত করছিল।

তাঁর দিনচর্যা তখন এমনই ছিল— সকালে মহাল (নাগপুরের একটি পাড়া) থেকে বেরিয়ে পড়তেন। পকেটে পয়সা না থাকায় হেঁটে নানা জনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের কাজ সেরে ঘর্মাক্ত কলেবরে বাড়ি ফিরতেন। দুপুরের স্নান-খাওয়া সেরেই পত্র ব্যবহার, বৈঠক, শাখা ও সম্পর্ক প্রায় রাত ১২টা পর্যন্ত চলত। প্রাতঃকাল থেকে রাত ১টা পর্যন্ত এমন কর্মব্যস্ততা। বিছানায় শুয়েও মস্তিষ্কে চিন্তাপ্রবাহ থাকতো অক্ষুণ্ণ। তার মধ্যে নাগপুরের প্রচণ্ড দাবদাহ। ইচ্ছা না থাকলেও সম্পর্কের জন্য প্রচুর মাত্রায় চা খেতে হতো। মাঝে মাঝে জ্বর হচ্ছিল, নাগপুরের বিজয়া দশমী উৎসবে সেবার তিনি প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে উপস্থিত থাকলেন। কাউকে কিছু বুঝতে দিলেন না। ভাণ্ডারায় যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও যেতে না পারার জন্য সেখানকার এক স্বয়ংসেবককে বাধ্য হয়ে পত্র লিখলেন— 'প্রচণ্ড জ্বর সত্ত্বেও এখনো শয্যা গ্রহণ করিনি, সম্ভবত এটাই আমার দোষ, এই অবস্থায় বারাণসীর অতিথিদের নিয়ে উমরেড ও ভাণ্ডারা যেতে না পারলেও আমাকে রামটেক যেতেই হলো এবং স্বাস্থ্যের ওপর তার অনিষ্ট পরিণাম হলো। সম্ভবত মোটরগাড়িতে সফর আমার সহ্য হয়নি।'

স্বাস্থ্যের এই অবনতিতে সবাই মিলে ডাঃ হরদাসের কাছে চিকিৎসা শুরু করালেন। তাঁদের পরামর্শ মতো ডাক্তারজীকে ডাঃ হরদাসের ধন্তোলীস্থিত বাংলোতে নিয়ে যাওয়া হলো। হাওয়া বদলের উপযুক্ত নিরিবিলি জায়গা, স্বাস্থ্যের একটু উন্নতি হতেই শুরু হলো স্বয়ংসেবকদের আনা-গোনা। চর্চা, বৈঠক, আবার রাত্রি জাগরণ। ঔষধে অনিয়মিততা কিন্তু সঙ্ঘকাজে অনিয়মিততা ছিল অসম্ভব। এভাবেই পবিত্র সঙ্ঘকার্য ও বিধি-নির্দিষ্ট পথ এগিয়ে চলছিল ভবিষ্যতের দিকে।

সংকলক— বিমলকৃষ্ণ দাস